একটি অসম বিতর্কের
সুষম সমাধান

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

জ্বিলহজ্জ-১৪৩৭ হিজরী
সেপ্টেম্বর-২০১৬ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

মূল্যঃ ৮৫ টাকা।

সূচীপত্র

সমাজের স্রোত ৪

সামাজিক ফতোয়া বনাম ইসলাম ১৪

ফতোয়াবাজীর প্রকারভেদ ২৬

ঐতিহাসিক ঐক্যমত ৪১

একটি অসম বিতর্ক ৫২

দলছুট পোলাপান ৬১

শয়তানের গেঁরো ৮৩

শান্তিতে রাখা আর শান্তিতে থাকা কি এক? ৯৬

সংস্কার নাকি কুসংস্কার ১০৮

দ্বীনের দাওয়াত নাকি দানের দাওয়াত ১২০

ফিতনা ফাসাদ কি? ১২৯

সুষম সমাধান ১৪১

সমাজের স্রোত

বাংলা ভাষায়, 'স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। যার অর্থ সবাই যেমন চলছে তেমন চলা। সমাজের আর পাঁচটি লোক যে পথে চলছে কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা না করে চোখ কান বুজে সেই পথে চলার নামই হলো 'স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া'। মুখে যে যা-ই বলুক না কেনো বাস্তব জীবনে বেশিরভাগ লোকই কিন্তু স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ারই পক্ষপাতী। এর কারণ,

প্রথমতঃ স্রোতের বিপরীতে চলতে গেলে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয় যা সহ্য করার মতো মনোবল খুব কম লোকেরই আছে। তাই তারা সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির কাছে হার মেনে, নিজেকে এবং নিজের স্ত্রী সন্তান ও পরিবার পরিজনকে সামাজিক নিয়ম নীতির অধীনে গড়ে তোলে। এ ধরণের কাপুরুষ শ্রেণীর লোকেরা নিজেরা হাজী বা নামাজী হওয়া স্বত্ত্বেও নিজের স্ত্রীকে বেপর্দা পর পুরুষের সামনে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি প্রদান করে এবং নিজের কন্যাকে বিদ্যালয়ে

গমন করে বিনা পয়সায় নাচ-গান করে মানুষের মনোরঞ্জন করা এবং ছেলে বন্ধুদের সাথে গোপন স্থানসমূহে ঘুরে ফিরে বেড়ানোর অনুমতি প্রদান করে। এসব কারণে তাদের অবশ্য অনেক দুর্ভোগও পোহাতে হয়। কারো তো স্ত্রী পালিয়ে যায়, কারও কন্যা গাঁজাখোরের হাত ধরে ভেগে যায়। সমাজের নিয়ম-নীতি মানতে গিয়ে এসব ক্ষয়-ক্ষতি তারা মুখ বুজে সহ্য করে। তবু প্রচলিত স্রোতের বাইরে এক পাও অগ্রসর হতে চায় না। তারা ভাবে, সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে গেলেই তাদের উপর আপদ বিপদ ছেঁয়ে আসবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যে কোনো মূল্যে সমাজের গণ্ডির ভিতরে থেকে সকল প্রকার আপদ বিপদ চোখ বুজে সহ্য করেন। ভিন্ন কোনো চিন্তা করার সাহসই তাদের মনে উদয় হয় না। এরা একই সাথে কাপুরুষ এবং নির্বোধ। এই দু'টি নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের কর্মকান্ড বুদ্ধিমানের নিকট সদা সর্বদা হাস্যকর মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ সাধারনভাবে মানুষ মনে করে, বেশিরভাগ

লোক যে পথে চলছে সেটাই সঠিক পথ। সুতরাং সবাই যে পথে চলছে তারও সে পথেই চলা উচিৎ। এমনকি এ সম্পর্কে একটা কথাও প্রচলিত আছে। সবাই বলে, 'দশ যেখানে খোদা সেখানে'। অর্থাৎ দশজন মানুষ যেটাকে সঠিক বলে, আল্লাহর নিকটও সেটা সঠিক। আল্লাহ ﷻ কিন্তু ঠিক এর উল্টো কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

{وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون}

যদি আপনি পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কথা শোনেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। তারা তো অনুমানের অনুসরণ করে আর কেবলই ধারণা করে। [আনয়াম/১১৬]

মানুষ যে কেবলই ধারণা করে আর ধারণার উপর নির্ভর করে অনেক কিছু করে তা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এ বিষয়ে একটা গল্পও প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির একটি রাজা হাঁস ছিল। একদিন রাজা হাঁসটা একটি ডিম পাড়লো। ঐ ব্যক্তি সেই হাঁসের ডিমটি নিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা

করতে লাগলো। এই ডিম থেকে বাচ্চা হবে, সেই বাচ্চা বড় হয়ে আবারও ডিম পাড়বে, এভাবে পুরো বাড়িটা রাজা হাঁসে ভরে যাবে। তারপর সেই হাঁস বেঁচে ছাগল কিনবো, ছাগল বেঁচে গরু ইত্যাদি। এতোসব চিন্তা করে তার আর দেরি সহ্য হলো না। সে ভাবল, রাজা হাঁস কবে ডিম দেবে সে জন্য অপেক্ষা না করে এখনই তার পেট চিরে সবগুলো ডিম বের করে নিই। এই ভেবে সে হাঁসটির পেট চিরে ফেলল। কিন্তু সে কোনো ডিমই পেলো না। তার হাঁসটিও আর বাঁচলো না। ফলে একূল-ওকূল দু'ই হারালো।

বোকামীর উদাহরণ হিসেবে এসব গল্প আমরা প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু নিজেরাও প্রায়ই অনুরূপ বোকামী করি। তবে সেটা বুঝতে পারি না বা বুঝার চেষ্টা করি না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একটি চাকুরীতে তিনটি পদে তিন হাজার লোক আবেদন করছে। সবাই জানে যার মামা খালু আছে, পকেটে টাকা আছে তার চাকুরী আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তবু যার মামা খালু নেই, পকেটেও টাকা নেই এমন ব্যক্তিও টাকা খরচ করে

ঠিকই দরখাস্ত করে। এর কারণ আর কিছু নয়,অন্তরের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা, হতেও তো পারে! এই উদ্ভট কল্পনাকে মৃত হাসের পেট থেকে সব ডিম এক সাথে বের করে নেওয়ার ধারণা ছাড়া অন্য কিছুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে না। একইভাবে মৃত পীরের কবরে গিয়ে সন্তান প্রার্থনা করা বা হিজিবিজি তাবিজ লিখে রোগ মুক্তি কামনা করা এসবই এধরণের অযৌক্তিক কল্পনার উদাহরণ।

এভাবে যারা মনে করে দুনিয়াতে যা খুশি আমল করবো আখিরাতে তার কোনো হিসাব নেই বা আখিরাত বলেই আসলে কিছু নেই তাদের এই চিন্তাধারাও অযৌক্তিক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। মৃত্যুই শেষ, এর পরে আর কোনো জীবন নেই। অতএব দুনিয়াতে যে ভাল কাজ করে বা খারাপ কাজ করে উভয়ের পরিণতি একই। তারা সবাই মৃত্যুর পর শেষ হয়ে যাবে। পাপী লোকেরা এমন ধারণা করে পাপ কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, এই ধারণা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক।

{أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا

الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون}

যারা অসৎ কাজ করে তারা কি এমনই ভাবে যে, তাদের সাথে নেককার লোকদের মতোই আচরণ করা হবে? কেবল জীবন আর মৃত্যুর মাধ্যমে সব শেষ হয়ে যাবে? তারা যা ধারণা করে তা খুবই নিকৃষ্ট। [সূরা জাছিয়া/২১]

তাদের ধারণাও অযৌক্তিক যারা মনে করে, কেবল মুখে ঈমান এনেছি বলার পর সারাটা জীবন যা খুশি তাই করে বেড়ালেও তাতে কোনো সমস্যা নেই। আখিরাতে মুক্তি নিশ্চিত। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (٢) ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين} [العنكبوت: ٢، ٣]

মানুষ কি মনে করে মুখে ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে আর তাদের কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না? অথচ পূর্বের লোকদের আমি পরীক্ষা নিয়েছি। এভাবে আল্লাহ জেনে নেবেন কে সত্যিই ঈমান এনেছে আর কে মিথ্যা বলেছে। [আনকাবুত/২,৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলনে,

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

তোমরা কি মনে করেছো জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনও তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের মতো অবস্থা হয়নি। তাদের উপর কঠিন বিপদ আপদ আপতিত হয়েছিলো। এমনকি তারা কেঁপে গিয়েছিল। [বাকারা/২১৪]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر

মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে যখন আল্লাহর দ্বীনের উপর টিকে থাকাটা জ্বলন্ত কয়লা হাতে ধরে রাখার মতো কষ্টকর হবে। [তিরমিযী]

এর বিপরীতে কিছু লোক সম্পূর্ণ বিনি পয়সায় জান্নাত পেতে চায়। আল্লাহর দ্বীনের শত্রুদের সাথে কোনোরূপ সংঘর্ষ বা ঝগড়া বিবাদে না জড়িয়ে বরং তাদের

পক্ষাবলম্বন করে তাদের মত ও পথ মেনে নিয়ে সারাটা জীবন বাতিল মতাদর্শে জীবন কাটিয়েও তারা জান্নাতের স্বপ্ন দেখে। বলা বাহুল্য যে, তাদের এই স্বপ্ন কেবলই স্বপ্ন। এর কোনো বাস্তবতা নেই। জান্নাত পেতে হলে দুনিয়াতে কিছু দুঃখ কষ্ট ভোগ করতেই হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات

জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে আর জাহান্নামকে আকর্ষণীয় বিষয় দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। [সহীহ মুসলিম]

অর্থাৎ জান্নাত পেতে হলে অনেক কষ্টকর কাজ করতে হবে। তাই অনেক মানুষ জান্নাত পাবে না। তা না হলে তো সবাই জান্নাতী হতো। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, মহান আল্লাহ ﷻ জান্নাত তৈরী করার পর জিব্রাইল عليه السلام কে তা দেখতে পাঠালে তিনি ফিরে এসে বললেন, এ জান্নাতের কথা যেই শুনবে সে এটা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে এবং আমার তো মনে হয় একটা মানুষও

জান্নাত থেকে দূরে থাকবে না। পরে আল্লাহ ﷻ জান্নাতকে কষ্টকর বস্তু দ্বারা ঘিরে রাখেন এবং আবারও জিব্রাঈল عليه السلام কে প্রেরণ করেন। এবার ফিরে এসে তিনি বলেন,

أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد

হে রব! আপনার সম্মানের কসম, এখন তো আমার ভয় হচ্ছে একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [আবু দাউদ]

জিব্রাঈল عليه السلام এর এই কথাই কিন্তু সত্যে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জান্নাতীদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। হাদীসে বলা হয়েছে, হাজারে একজন জান্নাতী আর নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী। এরপরও যারা আশা করে কোনোরূপ কষ্ট না করে কেবল স্রোতের তালে গা ভাসিয়ে দিয়ে হেসে খেলে জান্নাত পাওয়া যাবে তাদের এই আশা অযৌক্তিক নয় কি?

তারপরও বর্তমান যুগের অনেক ঈমানের দাবীদার স্রোতের তালে গা ভাসিয়ে দেওয়ার নীতি অবলম্বন

করছেন। কেবল তাই নয় অন্যদেরও স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাগুতী শক্তি যে সমাজ ব্যবস্থা চালু রেখেছে সে ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে তার সাথে খাপ খাইয়ে চলে নিরাপদ জীবন যাপন করাকেই তারা বুযুর্গী ও দ্বীনদারিত্ব বলে ঘোষণা করছেন। আর এই নষ্ট সমাজকে পরিবর্তনের চেষ্টাকে জঙ্গীবাদ ও উগ্রপন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করে তার নিন্দায় দিন পাত করছেন।

যে সকল কাপুরুষ স্রোতের তালে গা ভাসিয়ে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী তাদের নিকট এ পন্থা সঠিক বিবেচিত হতে পারে কিন্তু যে বীরপুরুষের অন্তরে বিপ্লবী চেতনা আছে, অন্যায়কে বদলে দেওয়ার মনসিকতা আছে সে এত সহজে আত্মসমর্পণ করে না। হাল বুঝে পাল তুলে বাতিলের সাথে তাল মিলিয়ে চলে না। এর জন্য তাকে অবশ্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিন্তু সেটা সে মুখ বুজে সহ্য করে। কারণ সে জানে জান্নাত পেতে হলে কষ্ট সহ্য করতেই হবে। আল্লাহ ﷻ এবং তার রসুল একথাই ঘোষণা করেছেন। আর জিবরীল আল-আমীন

এরই সাক্ষ্য দিয়েছেন। যারা এর বাইরে কেবল মুখে ঈমানের দাবী করে জান্নাত লাভ করতে চায় তারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কল্পনায় লিপ্ত যার কোনো ভিত্তি নেই।

সামাজিক ফতোয়া বনাম ইসলাম

অনেকে ভাবতে পারেন, সামাজিক ফতোয়া আবার কি জিনিস! বিষয়টা বেশ সহজ। উপরে আমরা সমাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছি। সামাজিক ফতোয়ার বিষয়টিও অনুরূপ। সমাজের লোক যা বলে এবং সমাজে যা চলে সে অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়াকেই সামাজিক ফতোয়া বলা যায়। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম কি বলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সমাজের মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ফতোয়া দেওয়াই হলো সামাজিক ফতোয়া। একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

আজ থেকে বেশ কিছু বছর পূর্বে যখন সমাজের লোক অপেক্ষাকৃত বোকা ছিল আর খবর ছড়ালো যে, কিছু লোক চাঁদে গমন করেছে। হুজুররা তখন ওয়াজ

করতেন,

- যে কেউ বলে মানুষ চাঁদে গেছে সে কাফির হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন তোমরা চাইলে আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা থেকে বের হয়ে যাও কিন্তু তোমরা তা পারবে না।

কিন্তু মানুষ যদি সত্যিই চাঁদে গিয়ে থাকে তবে সে পৃথিবীর সীমানা পার হলেও আকাশের সীমানা পার হয়েছিল কিনা সেটা তারা ভেবে দেখেনি। যাই হোক, পরে যখন মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে শুরু করলো আর হুজুররা বুঝতে পারলো, চাঁদে যাওয়ার ঘটনা অবিশ্বাস করলে মান থাকবে না তখন তারাই আবার বড় গলাই বলতে লাগলো,

- নিল আর্মস্ট্রং যখন প্রথম চাঁদে পা রাখেন তখনই সুমধুর কণ্ঠে আজান শুনতে পান বা চাঁদে তিনি রসুলের পায়ের ছাপ দেখতে পান ইত্যাদি। এসব ঘটনা দেখে তিনি মুসলিম হয়ে যান।

অর্থাৎ চাঁদে যাওয়ার ঘটনা আগে ছিল কাফির হওয়ার কারণ আর এখন হচ্ছে ঈমান আনার কারণ। এই হচ্ছে সামাজিক ফতোয়ার একটা নমুনা। ফতোয়াবাজ হুজুররা সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ফতোয়া রচনা করে বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে উস্তাদ। জন সাধারণের নিকটও বিষয়টা বেশ পরিচিত। তাই তো এ বিষয়ে বেশ কিছু গল্পও পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা গল্প এমন,

কোনো একজন সুপন্ডিত বক্তা কোনো এক এলাকায় বক্তৃতা করার ফাঁকে বলল, মেয়ে মানুষের সেলাই করা কাঁথা-বালিশ ব্যবহার করাই উচিৎ নয়। পরে ঘুমানোর সময় সে দেখলো, কাঁথা বালিশের বদলে তাকে দেওয়া হয়েছে ইট আর বস্তা। কারণ জানতে চাইলে এলাকার লোকেরা বলল, আপনি বলেছেন, মেয়ে মানুষের সেলাই করা কাঁথা-বালিশ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। আমাদের সকল কাঁথা বালিশই মেয়ে মানুষের সেলাই করা। তাই আমরা আপনার শোবার জন্য ইট আর বস্তা জোগাড় করেছি। বক্তা মহাশয় বুঝতে পারলেন কোনো উপায় নেই। তাই এই ব্যবস্থা মুখ বুজে মেনে নিলেন। তখন

ছিল শীতকাল। সারাটা রাত বেচারা অতি কষ্টে কাটিয়ে সকাল হলে পালিয়ে বাঁচলো। পরে নিজের উস্তাদের নিকট গিয়ে বলল, হুজুর গত বছর আপনার কাছে যে ওয়াজ শিখেছিলাম সে ওয়াজ করে তো আমার জীবন যায় যায় অবস্থা। সব শুনে হুজুর বললেন,

- আরে পাগল! সেতো গরমকালের ওয়াজ। তুমি শীতকালে কেনো করলে?

গল্পটা আমাদের দেশে বেশ প্রচলিত। সুতরাং হাল বুঝে পাল তোলা আর ঝোপ বুঝে কোপ মারার অভ্যাস যে আমাদের হুজুরদের আছে সেটা বোধ করি মানুষ বেশ ভাল করেই জানে।

এভাবে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে ফতোয়া দেওয়ার উদাহরণ অনেক আছে। তার মধ্যে নারী অধিকারের বিষয়টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। আগের যুগের হুজুররা বেশি বেশি স্বামীঅধিকার নিয়ে আলোচনা করতেন। যে স্বামী বউয়ের কথায় ওঠে-বসে সে যে কি নির্বোধ আর যে স্ত্রী স্বামীর কথার অবাধ্য হয় সে যে কি পাপী এই সব বিষয়ে তারা আলোচনা করতেন। সেই

সাথে ঘোষণা করতেন, নারী নেতৃত্ব হারাম। এসব বিষয়ে তারা হয়তো কিছুটা অতিরিক্ত কড়াকড়িও করতেন যতটা ইসলাম অনুমোদন করে না। তখনকার যেসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা আজও বেঁচে আছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই বিষয়টার সত্যতা পাওয়া যাবে। এখন কিন্তু সেসব ওয়াজের ছিটেফোটাও আর শোনা যায় না। এখন সময় বদলেছে। বিশ্বব্যাপী এখন নারী অধিকারের দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই দমকা হাওয়াই হুজুরদের ফতোয়া আচমকা পাল্টে গেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এখন তারা স্বামী অধিকারের বদলে নারী অধিকার নিয়েই বেশি আলোচনা করে থাকেন। তারা বলেন, ইসলামে নারী পুরুষকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কেউ তো আগ বাড়িয়ে বলে, বরং নারীদের অনেক বেশি অধিকার দেওয়া হয়েছে।

কার অধিকার আগে আদায় করতে হবে এই প্রশ্নের উত্তরে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথমে তোমার মায়ের, পরেও তোমার মায়ের, তারপরও তোমার মায়ের চতুর্থবারে তোমার বাবার।

এই হাদীস উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়, ইসলামে মেয়েদের অধিকার ছেলেদের চেয়ে তিনগুন বেশি। বিষয়টাকে রসিয়ে বলা হয়, গোল্ড মেডেলটিও মায়ের, সিলভার মেডেলও মায়ের, এমনকি ব্রোঞ্জ মেডেলটিও মায়ের। আর বাবা পাচ্ছেন কেবল সান্তনা পুরষ্কার।

কথাটা শুনে হল ভর্তি শ্রোতা আনন্দে হ্রস্বধ্বনি করে ওঠে। একটি বারের জন্যই কেউ ভাবে না যে, বর্তমান সময়ে নারী অধিকারের সাথে কথাটা না হয় মিলল, কিন্তু নারী অধিকারের যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে অদূর ভবিষ্যতে যদি পুরুষ অধিকার আন্দোলন চাঙা হয়ে ওঠে তখন পুরুষরা কেবল সান্তনা পুরষ্কারে সন্তুষ্ট থাকবে কি? তখন তো আবারও নতুন করে ফতোয়া রচনা করতে হবে। সে যুগের হুজুররা আবারও পুরাতন ওয়াজ করতে শুরু করবেন। বলবেন,

- স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত, রসুল বলেছেন, কাউকে সাজদা করতে বললে আমি স্ত্রীকে বলতাম স্বামীকে সাজদা করতে, স্বামীর আনুগত্য না করলে কোনো স্ত্রী জান্নাতে যেতে

পারবে না ইত্যাদি।

এভাবে সময়ের পরিবর্তনে হুজুররা ফতোয়া পরিবর্তন করে থাকেন। এ বিষয়ে সর্ব নিকৃষ্ট উদাহরণটি হলো, নিজে মুখে নারী নেতৃত্ব হারাম ঘোষণা করার পর নিজেই নারীর নেতৃত্বে জোট গঠন করা। আবার প্রশ্ন করা হলে অস্বীকার করে বলে আমি কখনও নারী নেতৃত্ব হারাম বলিনি। ডাহা মিথ্যা কথা! দেশের সাধারন মানুষ যে এদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলে না সেটাই এদের সৌভাগ্য।

আরও একটা সামাজিক ফতোয়ার উদাহরণ হলো, এরা বলে, মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ করা যায় না, মানুষ মেরে ইসলাম কায়েম করা যায় না ইত্যাদি। কিন্তু এরাই আবার হরতাল করে রাস্তা ঘাটে মানুষ পিটিয়ে মারে। কেবল পিটিয়ে মারলেও সেটা দয়া দেখানো বলে গণ্য হতো। এরা তো ককটেল ছুঁড়ে পুড়িয়েও মারে। যাকে মারছে সে বিরোধী পক্ষ হলেও জানতাম ঠিকই হয়েছে কিন্তু সেতো নিরীহ পথযাত্রী! কিন্তু এসব যেহেতু হরতালের নামে হচ্ছে তাই

তা বৈধ। কারণ সমাজের লোক হরতালকে মেনে নিয়েছে। জিহাদের নামে হলে এসবই অবৈধ হয়ে যাবে কারণ সমাজের লোক জিহাদকে সহ্য করে না। একেই বলে সামাজিক ফতোয়া।

হুজুরের দল বলে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না, প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না ইত্যাদি। অথচ বিজয় দিবস আর একুশের দিন তারাই মিলাদ মাহফিল করে একাত্তরের শহিদদের (!!) জন্য দোয়া মোনাজাত করে। এমনকি তখন যেসব হুজুররা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে রাজাকারগিরিতে লিপ্ত ছিল এখন তারাই নিজে হাতে সৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে। এ ইতিহাসকেই হয়তো ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলা চলে। যাই হোক, প্রশ্ন হলো, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কি মুসলিম ছিল না? আর তার বিরুদ্ধে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল তাদের কি রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল? বর্তমানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জঙ্গীবাদ হয় তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে তারা জঙ্গী না হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হবে কেনো? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর

নেই। তাহলে এসব আজগুবী ফতোয়া কেনো দেওয়া হচ্ছে? এর উত্তর একটাই, সামাজিক প্রয়োজনে। এটা হলো, সামাজিক ফতোয়ার আরও একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বলা বাহুল্য যে, এভাবে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামের প্রকৃত ফতোয়া বিকৃত করে মানুষের সামনে উত্থাপন করার অনুমোদন ইসলামে নেই। স্বয়ং রসুলে পাক ﷺ নিজেও এভাবে ইসলামকে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখতেন না। রসুলের যুগের লোকেরাও তাদের সমাজের সাথে মিল রেখে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার দাবী করতো। কিন্তু মহান রবের পক্ষ থেকে তা দৃঢ়ভাবে নাকচ করা হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم } [يونس: ١٥]

যারা আমার সাক্ষাতে (আখিরাত দিবসে) বিশ্বাসী নয় তারা বলে (এটা বাদে) অন্য একটা কুরআন নিয়ে এসো

বা এই কুরআনকে কিছুটা পরিবর্তন করো। আপনি বলুন, আমার খেয়াল খুশি মতো আমি এটাকে পরিবর্তন করার অধিকার রাখি না। আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার রবের পক্ষ থেকে আমার উপর অবতীর্ণ হয়। তার অবাধ্য হলে আমি কঠিন শাস্তির ভয় করি। [ইউনুস/১৫]

স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ সমাজের লোকের ইচ্ছামতো রবের বিধানে পরিবর্তন আনা হলে কঠিন শাস্তি হবে এমন ভয় করছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের ওলামা-হজরতরা এই ঘৃণ্য অপরাধ অবলিলায় করে যাচ্ছেন। তাদের দেলে এক চিলতে ভয়ও ঢুকতে পারছে না। রবের বিধান জানা সত্ত্বেও গোপন করে রাখছেন। কোনো দায়িত্ব অনুভূতি তাদের অন্তরে জাগছে না। আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার চিন্তাই মাথায় আসছে না। সত্যিই তাদের দুঃসাহস দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

{ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (١٧٤) أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى

والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار} [البقرة: ١٧٤، ١٧٥]

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন রাখে এবং তার বদলে স্বল্প মূল্য (দুনিয়ার ভোগ বিলাস) গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভরে না। আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা সঠিক পথের বদলে ভ্রান্ত পথকে বাছাই করেছে আর ক্ষমার বদলে শাস্তিকে বেছে নিয়েছে। অতএব, আগুনের শাস্তি ভোগ করার ব্যাপারে তাদের কি দুঃসাহস! [বাকারা/১৭৪,১৭৫]

রবের বিধানকে গোপন করে সমাজের লোকের ইচ্ছানুযায়ী ফতোয়া দেওয়া এমনই ভয়াবহ! কারণ মহান রব্বুল আলামীন যাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাদের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছেন যে তারা কিতাবের কোনো বিষয় গোপন করবে না বরং মানুষকে জানিয়ে দেবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}

[آل عمران: ١٨٧]

যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল মহান আল্লাহ তাদের নিকট এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তোমরা এটা মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেবে এবং তা গোপন রাখবে না। [আলে ইমরান/১৮৭]

মহান রবের এই নির্দেশকে যথাযথভাবে যারা পালন করবে এবং সমাজে চলমান অনিয়মের বিপরীতে বুক টান করে ইসলামের সঠিক বিধান প্রচার করবে তারাই প্রকৃতপক্ষে আলেম। আল্লাহর জন্য প্রয়োজনে তারা নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর যারা রবের বিধান গোপন করে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এবং সমাজের লোকদের মর্জি মাফিক ফতোয়া পরিবর্তন করে নিজের স্বার্থ হাসিল করবে তারাই বহুরূপী শয়তান। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান যুগের আলেম-ওলামাদের সিংহভাগই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। মহান আল্লাহ ধর্মপ্রাণ সাধারন মুসলিমদের ঐ সকল ধুর্ত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

ফতোয়াবাজীর প্রকারভেদ

উপরে আমরা সামাজিক ফতোয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি, ইসলামের সঠিক ফতোয়া গোপন করে সমাজের লোকদের মর্জি মাফিক ফতোয়া দেওয়াটাই হলো সামাজিক ফতোয়া। অন্য কথায় বলতে গেলে এর অর্থ হলো, সমাজের লোকেরা যা বলে সেটাকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়া। প্রশ্ন হলো, এ ধরণের জাল জোচ্চুরি কারা করে এবং কেনো করে? আসলে তিন শ্রেণীর লোক এধরণের জাল জোচ্চুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

প্রথমতঃ ভন্ড হুজুরের দল। যারা কেবলমাত্র পেটের দায়ে ইসলামী লেবাস পরিধান করে। আর আল্লাহ-রসুলের নাম ভাঙিয়ে দান তুলে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। এদের মধ্যে কেউ তো ইসলামী রাজনীতি করে কেউ আবার মসজিদ মাদ্রাসাতে খেদমত করে। তবে সেটা দ্বীনের খেদমত নাকি নিজের খেদমত তা বোঝা ভার। সমাজের প্রভাবশালীদের নিকট ধর্মের নামে ধরনা দিয়ে তাদের পেট চালাতে হয়। তাদের হাতের ময়লা খেয়ে

তারা বেঁচে থাকে। যেসব মসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তারা পেটের দায়ে চাকুরী করে, সমাজের বড় বড় হারাম খোর লোকদের দান ছাড়া সেখানে বেতনই হয় না। তাই তাদের হাতে রাখতে হয় এবং তাদের সাথে থাকতে হয়। তাদের মর্জি মাফিক ফতোয়া বাজারজাত করতে হয়। তারাই বেশি বেশি সামাজিক ফতোয়া দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ কিছু নির্বোধ ধার্মিক। যারা নিজের স্বার্থের টানে নয় বরং ইসলামের উপকার করার জন্যই ভুল ফতোয়ার প্রচার প্রসারে লিপ্ত হয়। ভুল ফতোয়া দিয়ে কিভাবে ইসলামের উপকার করা যায় সেটা ভেবে পাঠক অবাক হতে পারেন। তবে নির্বোধ লোকের যুক্তির অভাব নেই। হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে এর একটা নজীর পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম হাদীস জাল করেছিল এমন কিছু লোক যারা মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা রকম কেচ্ছা-কাহিনী নিজেরা রচনা করে রসুলের নামে বর্ণনা করতো। উদাহরণস্বরুপ, মানুষকে নামাজের দিকে আকৃষ্ট করা দরকার হলে তারা নামাজের ফজিলত

সম্পর্কে একটা হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করতো। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা বলতো, আমরা তো দ্বীনের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এমন করছি দ্বীনের ক্ষতি করার জন্যে তো নয়। মুহাদ্দিসিনরা সর্বসম্মতিক্রমে এই সকল লোকদের পন্থাকে ভ্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং রসুলের বাণী, 'যে আমার নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে সে জাহান্নামে স্থান করে নিক' এই কথার মধ্যে তারাও যে অন্তর্ভূক্ত সে বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

পূর্ব যুগের মুর্খ লোকেরা এ ধরণের পন্থা অবলম্বন করতো আর বর্তমান যুগে আধুনা পন্ডিত গোছের লোকেরা এ পন্থা অবলম্বন করে থাকে। হয়তো তারা শুনলো কেউ একজন, ইসলামে দাস প্রথার নিন্দা করছে অমনি তারা বলে ওঠে,

- দাস প্রথা প্রথমে ছিল পরে মানসুখ হয়ে গেছে।

কেউ হয়তো বলল, পুরুষ মানুষ চারটে বিয়ে করে। তারা উত্তরে বলে,

- বিয়ে তো করা যায় তবে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি

লাগে।

যদি কেউ বলে, ইসলামে বিধর্মীদের সাথে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে। কিছুমাত্র বিলম্ব না করে তারা বলে,

- সেটা তো আত্মরক্ষার জন্য।

এমনিভাবে ইসলামের যে বিধান নিয়েই কথা বলা হোক তারা আগা মাথা না ভেবেই কেবল প্রশ্ন কর্তাকে নিরব করার জন্য গোজামিল দিয়ে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে, ইসলামের মূল বিধানটি বিকৃত হয় সেদিকে তাদের মোটেও খেয়াল থাকে না। কোনো বিষয়ে কথা বলার আগে সে বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত রায় কি সেটা জেনে নেওয়ার চেষ্টাও করেন না। কেবলই নিজেদের খেয়াল খুশিতে যে কথাটা সঠিক মনে হয় তা নির্দিধায় বলে ফেলেন। আর দাবী করেন আমরা দ্বীনের কল্যাণে কাজ করছি।

এভাবে দ্বীনের খেদমত করতে গিয়ে এই শ্রেণীর লোক বোকামী বশত দ্বীনের সর্বনাশ করে ছাড়ে। তার উপর আবার সমস্যা হলো, এসব লোকের বিরুদ্ধে কথা বলাও

যায় না। এনাদের ভক্তরা আক্ষেপ করে বলেন, একটা লোক ইসলামের জন্য কাজ করছে তার পিছনে লাগার কি দরকার। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে ভাল ভাবে না জেনেই ইসলামের জন্য কাজে লেগে পড়াটা উচিৎ হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন কেউ তোলে না।

যাই হোক, এই শ্রেণীর লোকেরাই সম্ভবত খাটি নির্বোধ হিসেবে আখ্যা পাওয়ার যোগ্য। যেহেতু তারা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসীলের জন্য নয় বরং ইসলামের কল্যাণ করার নিমিত্তে বিভ্রান্ত কথা প্রচার করে। ফলে দুনিয়াতেও বঞ্চিত হয় আর আখিরাতেও লাঞ্চিত হয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য যারা বিভ্রান্ত কথা প্রচার করে তারা বুদ্ধিমান। যেহেতু তারা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন এতটাই নগন্য যে অনায়াশে তা শূন্য হিসেবে গণ্য করা যায়। সুতরাং উভয় দলই আসলে বোকা। যে কেউ আখিরাতের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সে-ই একজন পাকা নির্বোধ।

তৃতীয়তঃ বর্তমান যুগের নাস্তিক মুরতাদ ও কাফির

মুশরিকের দল। এই কথাটা শুনে পাঠক হয়তো অবাক হবেন। অবাক হওয়াই উচিৎ। নাস্তিক মুরতাদরা ফতোয়াবাজী করে একথা শুনলে কেউই অবাক না হয়ে পারে না। যতদূর জানা যায় তারা ধর্মের নামে ফতোয়াবাজী বন্ধ করতে চায়, ফতোয়াবাজীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। এখন তারাই আবার কিভাবে ইসলামের নামে ফতোয়াবাজী শুরু করলো! বিষয়টি প্রথমে একটু জটিল মনে হলেও সামান্য চিন্তা করলেই যে কেউ অতি সহজেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। প্রথমেই বলে রাখি, নাস্তিক মুরতাদরা ফতোয়াবাজী বন্ধ করতে চায় কথাটা আংশিক সঠিক হলেও পুরোপুরি সঠিক নয়। তারা সব ধরণের ফতোয়াবাজী বন্ধ করতে চায় না। ফতোয়াবাজী তাদের বিরুদ্ধে গেলে তারা তার পিছনে লাগে কিন্তু মোল্লারা যদি কখনও তাদের পক্ষে ফতোয়াবাজী করে তবে তারা তার পিছনে তো লাগেই না উল্টো পিছন থেকে সেটাকে সমর্থন করে যায়।

উদহরণস্বরুপ, বেশ কিছু কাল আগে যখন আলেম ওলামারা তসলিমা নাসরিনের অশালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে

রুখে দাড়িয়েছিলেন, তাকে নাস্তিক ও মুরতাদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং তাকে হত্যা করা উচিৎ এরকম ফতোয়া দিয়েছিলেন, আর সেই ফতোয়ার ফলে সত্যি সত্যিই দেশের মানুষ নাস্তিকতা আর নাস্তিকদের বিপক্ষে ভীষণ ক্ষেপে উঠেছিল তখন নাস্তিকরা এটাকে ধর্মের নামে ফতোয়াবাজী হিসেবে গণ্য করে তা বন্ধ করার দাবী জানায়। কিন্তু আজ যখণ হুজুররা ধর্মের নামে নাস্তিকরা যা-ই বলুক তাদের হত্যা করা উচিৎ নয় বরং বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনতে হবে এমন ফতোয়া দেয় এবং আবেগে উত্তেজিত হয়ে নাস্তিকদের গলাই ছুরিকাঘাত করা বা ইসলামের নামে আল্লাহর শত্রুদের হত্যা করা জঙ্গীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে তার নিন্দায় ফতোয়াবাজী করে তখন নাস্তিকরা কিন্তু মোটেও নাখোশ হয় না। এ ধরনের ফতোয়াবাজী বন্ধ করা উচিৎ সেটাও মনে করে না। উল্টো এই ফতোয়াবাজীর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং উৎসাহ দিয়ে বলে,

- জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মসজিদে মসজিদে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

এর অর্থ কি এই নয় যে, জঙ্গীবাদের বিপক্ষে ফতোয়াটি নাস্তিক-মুরতাদদের মনমতো হয়েছে? জঙ্গীবাদের ফতোয়া যে নাস্তিকদের মনমতো সেটা স্পষ্ট। কিন্তু ফতোয়াটি ইসলাম সম্মত কিনা সেটাই চিন্তার বিষয়। যদিও একটা ফতোয়া ইসলাম সম্মত হবে আবার নাস্তিক-মুরতাদদের মনমতো হবে এটা অত্যন্ত বিরল ঘটনা। তার পরও বলব, হতেও তো পারে। আর সে কারণেই পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করবো।

যাই হোক, এখানে আমাদের মূল বিষয় হলো, নাস্তিক মুরতাদরা ঢালাওভাবে ফতোয়াবাজী বন্ধের কথা বলে মোটেও তা নয়। আসল কথা হলো, ফতোয়াবাজী যখন বাতিলের বিপক্ষে হয় তখন তারা তা বন্ধের দাবী জানায়। আর সেটা যখন বাতিলের পক্ষে হয় তখন তারা তাতে উৎসাহ প্রদান করে। কেবল যে উৎসাহ প্রদান করে তাই নয় বরং নিজেরাও সেই ফতোয়াবাজীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কাফির-মুশরিকদের বড় বড় নেতারা এখন মুসলিমদের বলে,

- ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষ হত্যা এসবের কোনো স্থান নেই, জঙ্গীবাদ ইসলামে হারাম ইত্যাদি।

বিদেশী প্রভুদের কথার সাথে তাল মিলিয়ে মুসলিম দেশগুলোর তাগুতী শাসকরাও একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। প্রশ্ন হলো, ইসলামে কি আছে, কি নেই সে বিষয়ে তাদের এতো মাথা ব্যাথা কেনো? তারা কি ইসলামের মূল নীতি মেনে চলে? তারা কি ইসলামী আইনে দেশ পরিচালনা করে? সুদ-ঘুষ আর দূর্নীতি থেকে দূরে থাকে? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিরাপরাধ লোককে গোপনে বা প্রকাশ্যে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে হত্যা করে না? বিরোধী পক্ষকে দমন করার জন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করে না? এসব কি ইসলামে বৈধ? এগুলো কি ইসলামে আছে?

তারা নিজেরাই যখন জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ছোট বড় সকল ব্যাপারে ইসলামকে অমান্য করে তখন দু' পাঁচটা জঙ্গী ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে দু একটা হত্যাকান্ড চালালে তাতে তাদের এতো আপত্তি কেনো?

কেবল যে মৌখিক আপত্তি করে তাই নয়। বিশ্বের কাফির শক্তি এক জোট হয়ে কয়েকজন জঙ্গীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের সমূলে উৎপাটন করতে চায় আর মুখে বলে,

- আমাদের এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। বরং কতিপয় সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে এই পবিত্র ধর্মকে খাটো করছে।

বোঝা যাচ্ছে, ইসলামের নামে বদনাম হতে দেখে আজকাল কাফির মুশরিকদের খুব কষ্ট হয়। তাই যাদের কারণে এই বদনাম হচ্ছে তাদের সাথে সর্বাত্মক লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ হিসেবে ইসলামের শত্রুরাই আজকের দুনিয়ার ইসলামের বড় খেদমতে লিপ্ত রয়েছে। এমনকি হুজুররাও এতটা খিদমতে লিপ্ত নন। জঙ্গীবাদ নামের এই জঘন্য পাপকর্মের বিরুদ্ধে মসজিদে বসে যতটাই ফতোয়াবাজী করুন এর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা বা সেই যুদ্ধে জান মাল দিয়ে অংশ গ্রহণ করার মনোবল তাদের নেই। তারা কেবলই ফতোয়া দিয়ে কাফির মুশরিক আর তাগুতী সেনাদের জঙ্গীদের পিছনে লেলিয়ে দিচ্ছেন। আর কাফির মুশরিকরা জঙ্গীবাদের

বিরুদ্ধে লড়াই করে হুজুরদের পক্ষ থেকে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে। এই সমবন্টন দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। নাস্তিক-মুরতাদ আর ফাসিক-ফুজ্জারদের সাথে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের এই বৃহত্তর ঐক্যজোট গঠিত হতে দেখে আমরা সত্যিই পুলকিত!

ঘোড়ার ডিম জাতীয় এই আশ্চর্যজনক বিষয়টাকে মোল্লাদের ভীমরতি হিসেবে আখ্যায়িত করাটাই যদিও অধিক সঙ্গত। তারপরও আমরা বলব, এর মাধ্যমে আমাদের ওলামা হজরতরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, জাত শত্রুর সাথেও জোট গঠন করা যায় এবং তাদের মাধ্যমে দ্বীনী কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। অতএব বিষয়টাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

এমনিভাবে কাফির মুশরিকরা এখন ইসলামের খেদমতে লিপ্ত। আর ইসলামের পক্ষে ফতোয়াবাজীতে সদা সচেষ্ট। প্রায় প্রতিটি বক্তব্যেই তারা ইসলামের শান্তি, সম্প্রীতি ও সহশীলতার কথা তুলে ধরেন ও ইসলামের নামে জয়গান গেয়ে চলেন। কিছুকাল আগেও যারা ইসলামকে নিন্দা মন্দ করতো, ইসলামের বিধান নিয়ে তামাশা করতো

তারা আজ ইসলামের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলে। একজন খাটি মুসলিম হিসেবে এই পট পরিবর্তনে হয়তো খুশিই হওয়া উচিৎ। কিন্তু কাফিরদের উপর আমাদের ঈমান দুর্বল। কেবল দুর্বল তাই নয় বরং একবারেই নড়বড়ে। ইসলামের ব্যাপারে তাদের এই অতিভক্তি আমাদের নিকট চোরের লক্ষণ বলেই মনে হয়। নির্বোধ হুজুররা হয়তো তাদের বিশ্বাস করে এবং ইসলামের পক্ষে তাদের ফতোয়াবাজী শুনে এতটাই পুলকিত হয় যে তারা যা বলে সেটাই হুবহু মুখস্থ করে নিজেরাই বলতে শুরু করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এতটা বোকামী করে না। সামান্য চিন্তা করেই সে বুঝতে পারে এই ভক্তির আড়ালে কাফিরদের সত্যিকার চেহারাটা কতটা কুৎসিৎ। তাদের ইসলামের সুনাম করাটা ইসলামের খেদমত করার জন্য নয় বরং ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য।

বিষয়টা ঐ ধূর্ত শেয়ালের মতো যে দেখলো গাছের ডালে একটা কাক মুখে এক টুকরো মাংস নিয়ে বসে আছে। শেয়ালের খুব ইচ্ছা হলো, মাংসটি খাওয়ার কিন্তু গাছের মগডালে চড়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে একটা

বুদ্ধি আঁটলো। গলা উঁচু করে বলল, আহা! ঐ কাকটা দেখতে কি সুন্দর! তার গানের গলাও নিশ্চয় ভাল হবে। কিন্তু সে গান গায় না কেনো? কথাটা শুনেই কাক কা কা করে গান গাইতে শুরু করলো। অমনি তার মুখের মাংসের টুকরোটি মাটিতে পরে গেলো আর শেয়াল সেটা খপ করে তুলে নিয়ে উদরস্ত করলো।

ইসলামের সাথে বর্তমান যুগের কাফিরদের আচরণ হুবহু এই প্রকৃতির। বিগত সময়ে তারা সরাসরি ইসলামের নিন্দা-মন্দ ও তিরষ্কার করেছে। ইসলাম বর্বর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সেকেলে ইত্যাদি বদনামে অভিহিত করেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কাজে নাস্তিক মুরতাদদের লেলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেসব অপপ্রচারে কোনো লাভ হয়নি। কাফিরদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ ইসলাম পরিত্যাগ করে নি। উল্টো কাফির-মুশরিকদের উপরই চটেছে। ফলে হিতে বিপরীত হয়েছে। এভাবে সরাসরি আঘাতে কাজ না হওয়াই তারা এখন ভিন্ন কৌশলে ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। তারা বলছে,

- ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানুষ হত্যা করা এ ধর্মে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললেই তাকে মেরে ফেলতে হবে বা কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এটা ইসলামের নীতি নয়। বরং শত্রু মিত্র সবার সাথে ভাল আচরণ করতে হবে এটাই ইসলাম। যারা এটা মানে না তারা জঙ্গী, সন্ত্রাসী। তারা সমাজের শত্রু। সকলে মিলে তাদের নির্মূল করতে হবে।

এই পন্থা গ্রহণের কারণে কাফিররা নানাভাবে উপকৃত হয়-

প্রথমতঃ কাফির মুশরিকরা সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে মুসলমানরা তাদের সে কথা গ্রহণ তো করবেই না বরং রেগে যাবে এবং কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হবে। তখন তাদের সামলে রাখা কঠিন হবে। তার চেয়ে যদি ভ্রান্ত কথাটাকে ইসলামের নামে চালানো হয় তবে মানুষ সেটা চোখ বুজে গ্রহণ করবে। ফলে বিভ্রান্তির প্রচার প্রসার করা অনেক বেশি সহজ

হবে।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ বিগ্রহ ইসলামে বৈধ নয় একথা প্রচার পেলে কাফিরদের বাকী কাজ সহজ হয়ে যায়। এরপর তারা যা খুশি তাই করবে। কিন্তু প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার মতো কেউ থাকবে না। কেউ একটু প্রতিবাদ করতে গেলেই বলা হবে এটা কিন্তু ইসলাম সমর্থন করে না ফলে সে আবার নিরব হয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশি সুবিধা আর কি হতে পারে!

তৃতীয়তঃ যদি মুসলমানদের বোঝানো যায়, কাফির-মুশরিক ও তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তারা মুজাহিদ বা বীর তো নয়ই বরং ইসলামের শত্রু ও জঙ্গী তাহলে এসব জঙ্গীদের কচুকাটা করলেও মুসলিম জাতি কোনো প্রতিবাদ করবে না। উল্টো জান মাল দিয়ে এ কাজে তারা কাফিরদের সাহায্য সহযোগিতা করবে। তাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

এই প্রকারের নানাবিধ সুবিধার কথা চিন্তা করে কাফির মুশরিকরা ইসলামের নামে বদনাম করার পরিবর্তে ইসলামের পক্ষে ফতোয়াবাজীর কাজে লিপ্ত হয়েছে।

অতএব এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই বরং যত বেশি সম্ভব রাগান্বিত হওয়াই অধিক সঙ্গত।

ঐতিহাসিক ঐক্যমত

হুজুরগণ যে কেবল ঝোপ বুঝে কোপ মারতে অভ্যস্ত তাই নয়। তাদের ব্যাপারে আরও অনেক বদনাম প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটা হলো, দলাদলি আর মতপার্থক্য করা। কোনো বিষয়ে এক মত হওয়াটা যেনো হুজুরদের ধাতেই সয় না। যতটা পারে একে অন্যের সাথে মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে কাঁথা ছেড়ার তত্ত্বটি উল্লেখ করা যেতে পারে। হুজুরদের সম্পর্কে কথা হলে সমাজের লোক প্রায়ই তত্ত্বটি পেশ করে থাকে। ধারনা করা হয়, যদি দু'জন আলেমকে একই কাঁথার নিচে শুতে দেওয়া হয় তবে সকাল বেলা দেখা যাবে কাথাঁটি মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেছে। সারা রাত একে অপরের সাথে মতপার্থক্য, রাগারাগি আর টানাটানি করার কারণেই কাথাঁটি ছিড়ে যাবে বলে মনে করা হয়। এই অনুমান সত্য কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয় নি। হয়তো ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে

না। কারণ হুজুরদের মধ্যে দ্বিমত এতটাই বেশি যে দু'জন আলেমকে একই কাথাঁর নিচে রাখাই সম্ভব না। ফলে এভাবে একত্রে রাখা হলে কাঁথা দু'ভাগে ভাগ হয় কিনা তা জানাও সম্ভব নয়। এটা একটা তত্ত্ব মাত্র, এখন একটা সত্য ঘটনা শুনুন।

একজন মাদ্রাসার মুহতামিম মাদ্রাসার কল্যাণে দু'পাঁচ টাকা কালেকশন করার নিমিত্তে একটা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করলেন। সেখানে তিনি দুজন বক্তাকে (উপযুক্ত পারিশ্রমিক সমেত) নিমন্ত্রণ করলেন। প্রথম বক্তা মঞ্চে উঠে বললেন,

- সল্লে আলা, বালাগাল উলা এসব বলা যাবে না। এগুলো বিদয়াত।

পরের বক্তা মঞ্চে উঠেই শুরু করলেন,

- বালাগাল উলা বিকামালিহি ..... সল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি।

ব্যাস। জনগন টাকা দেবে কি সবাই গাধার মতো বোকা বনে গেলো। যে বেচারা ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে এই

মাহফিলের আয়োজন করেছিল তার বিপুল পরিমাণ লোকসান হয়ে গেলো। কাঁথা ছেড়ার থেকে এই ঘটনাই বা কম কিসে!

এসব ঘটনায় তিক্ত বিরক্ত হয়ে, নামাজ-কালাম ছেড়ে দিয়েছে এমন লোক অনেক আছে। তারা বলে,

- আগে হুজুররা ঠিক হোক। তারা এক দলে আসুক। আমরা তখন তাদের কথা মানবো।

কথাটা কতটুকু যৌক্তিক আর কতটা অযৌক্তিক সে বিষয়ে আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে এধরনের লোকদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে। তাদের সাধ পুরা হয়েছে। বর্তমান যুগে নানা মত ও পথের হুজুরগণ একটা বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অনেকে ভাবতে পারেন সকল বিষয় বাদ দিয়ে কেবল একটা বিষয়ে একমত হয়ে লাভ কি? আসলে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। যেখানে দ্বিমতের ঠেলায় কাঁথা-কম্বলই ছিড়ে যাচ্ছে সেখানে একটা বিষয়ে একমত হলেই বা কম কিসে! অতএব, বিষয়টাকে ছোট মনে করার কোনো সুযোগ নেই। এই ঐক্যমতকে আমরা ঐতিহাসিক

ঐক্যমত হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি এবং যেদিন এই ঐক্যমত সংগঠিত হয়েছে সে দিনটিকে বিশ্ব ঐক্য দিবস হিসেবে আখ্যা দিতে পারি। প্রশ্ন হলো, এ যাবত কালে যারা নিজেদের মধ্যে কেবলই দ্বন্দ্ব করেছে তারা কি এমন বিষয়ে একমত হলো? প্রশ্নটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ! তাই সরাসরি উত্তরটি না দিয়ে আমি একটি কুইজের আকারে পাঠকের সামনে পেশ করছি যাতে পাঠক নিজেই সঠিক উত্তরটি বাছাই করতে পারেন।

নিচের কোন ব্যাপারটিতে বর্তমান যুগের আলেম-ওলামারা একমত?

ক) কবর পূজা বন্ধ করতে হবে।
খ) দেশে ইসলামী আইন চালু করতে হবে।
গ) বিদেশী এন, জি, ও বাতিল করতে হবে।
ঘ) জঙ্গীবাদ নির্মুল করতে হবে।

সচেতন পাঠক ইতোমধ্যে সঠিক উত্তরটি ধরে ফেলেছেন আশা করি। হ্যাঁ, এটাই সত্য কথা যে, উপরের চারটি বিষয়ের মধ্যে কেবল জঙ্গীবাদ নির্মূল করা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে আলেমরা এক মত হয়ে জোর দাবী

জানায়নি। দেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন স্থানে তথাকথিত ওলীদের কবরে মানুষ সাজদা করে এবং কবরওয়ালার নিকট প্রার্থনা করে। আর জাতীয় নেতাদের কবরে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলী পেশ করে। এসব কাজ যে ইসলামবিরোধী সেটা তো সবাই জানে কিন্তু এর প্রতিবাদে হুজুররা একমত হয়ে জোর প্রচেষ্টা করেছেন কি? উল্টো একদল হুজুর নিজেরাই এসব কাজে লিপ্ত রয়েছেন। এমনিভাবে দেশে ইসলামী আইন-কানুন নেই এটা সবাই জানে। কিন্তু ইসলামী আইন চালু করতে হবে মর্মে ঐক্যবদ্ধ দাবী কি হুজুররা সরকারের সামনে পেশ করেছেন? বিদেশী এনজিওগুলো যে মুসলমানদের ঈমান-আমল ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে সেটা কে না জানে? মেয়েদের বেপর্দা আর চরিত্রহীন করা, পুরা সমাজটাকে সুদে ছেঁয়ে দেওয়া ইত্যাদি ভয়াবহ অপকর্মে তারা লিপ্ত। কিন্তু এসব এনজিও বন্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ দাবী ওলামা হজরতরা জানাতে পারেননি। উল্টো এসব এনজিওদের ডাকে সভা সমাবেশে বহু সংখ্যক হুজুর হাজিরা দেন। সেখানে নাস্তাপানি এবং সম্মানী গ্রহণ করত বাড়ি ফিরে আসেন। কেউ কেউ সরাসরি এসব

এনজিওতে বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে চাকুরী করেন। তাদের কান্ডজ্ঞান দেখে অবাক না হয়ে পারিনা।

কোনো কোনো আলেম যে এসবের বিরুদ্ধে কথা বলেন সেটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যতটা উৎসাহ আর ঐক্যমত নিয়ে কাজ করছেন এসবের বিরুদ্ধে ততটা করতে পেরেছেন কি? নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর যে কোনো মানুষ এর উত্তরে না ছাড়া ভিন্ন কিছু বলতে পারে না। এখানেই একটা প্রশ্ন জাগে, এত অপরাধ অপকর্ম বাদ দিয়ে হুজুররা সবাই মিলে জঙ্গীদের পিছনে কেনো লেগেছেন?

কেউ হয়তো বলবেন, দ্বীনী দায়িত্ববোধের কারণেই ওলামাগণ জঙ্গীদের পিছনে লেগেছেন। জঙ্গীরা মানুষ হত্যা করবে আর আলেমরা চুপ করে বসে থাকবে তা তো আর হয় না। অন্যায়ের বিপরীতে কথা বলা আলেমগণের দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব তারা যথাযোগ্য ভাবেই পালন করে থাকেন। তাইতো জঙ্গীদের বিপক্ষে কথা বললে তারা আত্মঘাতি হামলা করতে পারে এমন ভয় থাকা সত্ত্বেও ওলামাগণ নির্ভিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে

ফতোয়াবাজী করে যাচ্ছেন।

ওলামাগণ সত্যিই দায়িত্ববান এবং দ্বীনী দায়িত্ব পালনের জন্যই জঙ্গীবাদের বিপক্ষে কথা বলছেন এ দাবী মেনে নিলে কিন্তু আরও কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। মানুষ খুন তো সরকার পক্ষও কম করে না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে খেয়াল খুশি মতো বিরোধীপক্ষ এমনকি সম্পূর্ণ নিরোপেক্ষ ব্যক্তিদেরও যে সরকারপক্ষ অকারণে হামলা মামলার স্বীকারে পরিণত করছে এবং হত্যা ও গুম করে দিচ্ছে এ খবর কাক-পক্ষিও জানে। প্রশ্ন হলো, বীরপুরুষ ওলামা হযরতরা সরকারের বিপরীতে কথা বলেন না কেনো? নাকি সেখানে জুজুর ভয় আছে বলে সকল হুজুর চুপ করে থাকেন। উল্টো এই জালিম সরকারকে সঙ্গী করেই তো তারা জঙ্গীবাদের বিপরীতে কথা বলেন। একজন জালিমের বিপক্ষে বলার জন্য অন্য জালিমের পক্ষ নেওয়াটা কি নিরোপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী বলে গণ্য হতে পারে? তা যদি না হয় তবে এসব আলেমগণই যে আসলে জালেম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে কি?

এছাড়া আরও একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। জঙ্গীবাদ মোকাবিলার জন্য ওলামা হজরতরা তাগুত সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। জঙ্গীবাদ নির্মূলের কত শত পন্থা তারা আবিষ্কার করেছেন এবং করে চলেছেন। একটি পন্থা ব্যর্থ প্রমাণিত হলে অন্য আরেকটি পন্থায় চেষ্টা করছেন। জঙ্গীদের জেল-ফাস দেওয়া, তাদের পরিবার পরিজনদের গ্রেফতার করা, সন্দেহভাজন জঙ্গী নামে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের আটক করে মারপিট করে পঙ্গু করে দেওয়ার পর "সে আসলে জঙ্গী নয়" এমন মন্তব্য করে মুক্ত করে দেওয়া ইত্যাদি কত যে পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তার গোনতি নেই। এর চেয়ে অনেক সহজ একটা সমাধান যে রয়েছে। যার কথা না তাগুতী সরকার মনে রাখে আর না আলেম ওলামারা তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর তা হলো, রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান কায়েম করে দেওয়া। জঙ্গীদের খুন খারাবী যতই খারাপ হোক তারা যে উদ্দেশ্যে কাজটা করে সেটা কিন্তু অত্যন্ত মহৎ ও সঠিক। তারা বলে আল্লাহর আইন কায়েম করতে হবে। তো তাগুতী সরকার যদি জঙ্গীদের মুখ বন্ধই করতে চায় তবে শান্তির ধর্ম ইসলামের

বিধানগুলো কায়েম করে দিলেই পারে। ফলে দেশে জঙ্গীবাদও থাকবে না ইসলাম বিরোধী আইনও থাকবে না। দুটো সমস্যাকে এক সাথে শেষ করে ফেলাই কি অধিক ইনসাফপূর্ণ নয়! কিন্তু জঙ্গীবাদ নির্মূলের এই ইনসাফপূর্ণ সমাধান হুজুরগণ সরকারকে একটি বারও মনে করিয়ে দিয়েছেন কি? এসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব অনুভূতি বুঝি মোটেও সাড়া দেয় না। কেবল জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় যত দায়িত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এভাবে নরম কাঠে পেরেক মারার কাজটা মোটামুটি সবাই করতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী লোক দেখলে ভক্তিতে অনুগত কুকুরের মতো খালি কু কু শব্দ করতেই বেশিরভাগ লোক পছন্দ করে। বলা বাহুল্য যে, এই সব কুকুর স্বভাবের লোকদের মধ্যে বেশিরভাগ হুজুর পড়ে যান। তাই তো দল মত নির্বিশেষে সকল মোল্লা আজ তাগুতের সাথে হাত মিলিয়ে জঙ্গীবাদের বিপক্ষে ভূমিকা রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আগামীকাল যদি জঙ্গীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেই তবে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে এভাবে বুক টান করে কথা বলতে পারবেন কি? মুখে তারা যাই বলুন প্রকৃত পক্ষে সেদিন যে তারা

জঙ্গীদের সামনে কুকুরের মতো কু কু শব্দই কেবল করে যাবেন সাধারন মানুষ সেটা বোঝে। হাল বুঝে পাল তোলা অভ্যাস তো তাদের অনেক পুরোনো। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই তাদের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সাধারন মানুষ এটা জানে। তাইতো তারা হুজুরদের গুজুর গুজুরে এখন আর খুব একটা কান পাতেন না। নামাজ রোজা করতেই হয় সেকারণেই মানুষ মসজিদ মাদ্রাসায় দুএকটা হুজুর পোষে কিন্তু তাদের খুব একটা পোছে না। একটা সময় ছিল যখন হুজুরদের ফতোয়াই লাখ লাখ মানুষ উঠতো বসতো কিন্তু এখন কেউই তাদের কথা নিয়ে নাক গলায় না। এতো এতো ফতোয়া দিচ্ছেন তার পরও জঙ্গীবাদ নির্মূল তো দূরের কথা তাদের অগ্রযাত্রা একচূলও বাধাগ্রস্থ করতে পেরেছেন কি? জঙ্গীবাদের কিছু ক্ষতি করলে তাগুতী সরকারের সেনাবাহিনীই করেছে কিন্তু হুজুরদের প্যানপ্যানানিতে কোনো কাজ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তাদের কথা শুনে যে কটা লোক জিহাদ থেকে পিছপা হয়েছে তারা মূলত কাপুরুষ স্বভাবের। কোনো ফতোয়া না দিলেও তারা ঠিকই বসে থাকতো। কিন্তু যাদের অন্তরে

পরিপক্ক ঈমান আছে তাদের কি কেউ ধরে রাখতে পেরেছে? আরব বিশ্বের সব হাতির মতো মোটা মোটা আলেম কিতাব পত্র ঘাটাঘাটি করে বহুকাল ধরে জিহাদের বিপক্ষে নানা রকম ফতোয়াবাজী করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জিহাদে আরবদের অংশগ্রহণই বেশি সেটা কিন্তু বিশ্ব জানে। তাই বলবো, ফু দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে ফেলা যায় না। তাই হুজুরদের ফতোয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী জিহাদ কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হলো সেটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই বরং এসব ফতোয়ার কারণে অবলা হুজুরদের আখিরাত কিভাবে অবেলায় শেষ হয়ে গেলো সেটাই চিন্তার বিষয়।

এসব সংশয়ের কারণে বহু যুগ পর আলেম-ওলামারা যে বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন তাতে পুলকিত না হয়ে দুঃখিত হওয়াই ঈমানের দাবী হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়েও বেশি দুঃখিত হই যখন দেখি, যে বিষয়ে হুজুররা একমত হয়েছেন সে বিষয়ে কেবল হুজুর সম্প্রদায় নয় বরং দুনিয়ার বাঘা বাঘা সব নাস্তিক আর বড় বড় কুফরী ও তাগুতী শক্তি হুজুরদের সাথে এক মত হয়েছে। তখনই

আমরা সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি এই ঐক্যমতের মধ্যে ইসলামের জন্য কোনো কল্যাণ নেই। বরং এর মধ্যে সুগভীর এক ষড়যন্ত্রের আভাস রয়েছে। ঠিক তখনই আতংকে আমাদের শরীর শিউরে ওঠে। আর মুখের ভাজে সে আতংকের চিহ্ন ফুটে ওঠে। মহান আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার কালো ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি দিন।

একটি অসম বিতর্ক

অসম হলো একটি তুলনামূলক বিশেষণ। দুটি জিনিসের মধ্যে সংখ্যা ও শক্তিতে বেশ-কম থাকলে বিষয়টিকে অসম বলা হয়। দূর্বল ও সবলে লড়াই হলে সেটাকে বলা হয় অসম লড়াই। সে হিসেবে ঝগড়া বিবাদ বা বিতর্কে একটি পক্ষ দূর্বল হলে সেটাকে অসম বিতর্ক বলা চলে। এ ধরণের একটি অসম বিতর্কের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়।

কোনো এক বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের দুটি ভাগে ভাগ করে বিতর্কের আয়োজন করা হতো। হেড মাস্টার

সাহেব বিতর্কের বিষয় ঠিক করে দিতেন আর দু'চার জন শিক্ষক তাতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। ঐ বিদ্যালয়ের হেড মাস্টারের ছেলেও পড়াশুনা করতো। একবার তার পালা আসলে হেড মাস্টার সাহেব নিজের ছেলেকে বিজয়ী করার জন্য কুটকৌশল অবলম্বন করেন। তিনি বিতর্কের বিষয় করেন, 'গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু'। আর নিজের ছেলেকে এই বিষয়ের পক্ষের দলে রাখেন। তার সাথে দিলেন তুখোড় কিছু তর্কবাগীশ ছাত্র। আর এই বক্তব্যের বিপক্ষে বিতর্ক করার জন্য নিম্ন মানের কয়েকজন ছাত্রকে রাখলেন। এভাবে বিতর্কে নিজের ছেলের বিজয় মোটামুটি পাকা করে ফেললেন। বিতর্কের দিন পক্ষের দলের সকলে অত্যন্ত গঠনমূলকভাবে আলোচনা করে প্রমাণ করলো গাছ আসলেই উপকারী বন্ধু। গাছে ফল হয়, গাছ থেকে কাঠ হয়, গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ইত্যাদি নানাবিধ উপকারীতা বর্ণনা করে তারা বক্তব্য দিলো। তাদের কথার প্রতিউত্তরে দর্শকরা হাত তালি দিয়ে মাঠ কাঁপিয়ে তুলল। বিরোধী পক্ষের কেউই খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না।

গাছ উপকারী বন্ধু এ বক্তব্যের বিপরীতে কিই বা বলা যায়? কেবল একজন বলল,

- ঝড়ের রাতে গাছ আমাদের মাথার উপর ভেঙে পড়ে। এতে অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটে। অতএব, গাছ আমাদের বন্ধু নয় বরং শত্রু।

কথাটা শুনে হাত তালি দেওয়ার পরিবর্তে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে একটা ছেলে একটু ভিন্নভাবে আলোচনা শুরু করল। সে বলল,

- গাছ যে আমাদের নানাবিধ উপকার করে তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। প্রতিপক্ষের বক্তারা সে বিষয়ে অনেক প্রমানাদি পেশ করেছেন। আমিও তার সাথে এক মত। উপকার করলেই কাউকে উপকারী নিশ্চয় বলা যায় কিন্তু বন্ধু বলা যায় কি? এই যেমন ধরুন, এই স্কুলের কেরানীরা স্যারদের অনেক উপকার করে থাকেন। তাদের খাতা-পত্র বহন করেন, হুকুম তামিল করেন। তারা কি হেড মাষ্টারের বন্ধু? স্কুলে কর্মরত ঝাড়ুদার প্রায়ই হেড মাষ্টারের কক্ষটি ঝাড়ু

দেন। এভাবে তিনি তার উপকার করেন। এ হিসেবে ঝাড়ুদারকে উপকারী নিশ্চয় বলা যায়। এর অর্থ কি এই যে, ঝাড়ুদার হেডমাষ্টারের বন্ধু? এটা গেলো মানুষের ব্যাপারে এখন আসা যাক জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে। গরু আমাদের উপকার করে, গাভী দুধ দেয়। এর ফলে তাদের উপকারী বলা যায় কিন্তু তাই বলে গরুকে বন্ধু আর গাভীকে বান্ধবী বলা কি সঙ্গত হবে? আমি নিজে চোখে দেখেছি হেড মাষ্টারের বাড়িতে একটা কুকুর আছে। শুনেছি সারা রাত সে বাড়ি পাহারা দেয়। এভাবে উপকার করে বলেই সেই কুকুর কি মাষ্টার সাহেবের বন্ধু হবে? প্রাণীর ব্যাপারেই যদি অবস্থা এই হয় তবে উদ্ভিদের বিষয়ে আর কি বলা যেতে পারে! তাই আসুন আমরা বন্ধু শব্দটি বাতিল করে বলি গাছ আমাদের উপকারী সেবক। তাহলে আর কোনো বিতর্ক থাকবে না।

তার এই উপস্থিত বুদ্ধিতে বিচারকগণ বেশ চমকিত

হলেন। তারা বিপক্ষের দলটিকেই বিজয়ী ঘোষণা করলেন। এভাবে সুষম বিচার বিশ্লেষণের কারণে একটি অসম বিতর্কেও বিজয় লাভ করা সম্ভব হলো।

গল্পে এটা সম্ভব হলেও বাস্তবে কিন্তু এ ধরণের অসম প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করা বেশ দূরহ। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো মানুষ বুঝে হোক না বুঝে হোক সবলের পক্ষ নেয়। আর দূর্বলের বিপক্ষে যায়। সাধারনভাবে কেউই দূর্বলের পক্ষ নিতে চায় না। এভাবে সবল আরও বেশি সবল হয়। আর দূর্বল অতিরিক্ত দূর্বল হয়ে পড়ে। এটাই সমাজের নিয়ম। বিষয়টাকে 'তেলো মাথায় তেল ঢেলা' বলেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

সমাজে এই নীতির বেশ চর্চা আছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন লোককে কোনো এক পকেট মারকে পিটাতে দেখলে যে কেউ ঘটনার আগা মাথা না জেনেই তাদের সাথে পিটাতে লেগে যান। এভাবে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন। এটা হয়তো খারাপ নয়। কিন্তু একইভাবে ক'জন চাঁদাবাজ ছোঁকড়াকে কোনো নিরীহ পথচারীর উপর নির্যাতন করতে দেখলে কেউ কি

প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়? এখানে মজলুমের প্রতি দায়িত্ব পালনের লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ একটাই, সে দূর্বল। এভাবে দূর্বল আর সবলের অসম প্রতিযোগিতায় সবাই সবলের পক্ষে থাকতে চায় আর দূর্বলকে এড়িয়ে চলে। সবলের সকল কাজই যেনো সঠিক আর দূর্বলের সব কিছুতেই দোষ। এই অসম নীতির কারণে অনেক সময়ই জোর করে সবলকে সঠিক আর দূর্বলকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা হয়। অসম নীতি পরিত্যাগ করে সুষমভাবে চিন্তা করলে হয়তো দূর্বলই সঠিক প্রমাণিত হতো। কিন্তু সেটা করা তো বেশ দুঃসাহসের পরিচয়। অতো দুঃসাহস তো আমাদের নেই। সেই সাহস আমরা আরও হারিয়ে ফেলি যখন বিতর্কটা হয় সরাসরি তাগুতী শাসকের সাথে। এই জালিমের সামনে সত্য কথা বলাটা সত্যিই খুব কঠিন। এক্ষেত্রে অবস্থা অত্যন্ত জটিল। যেহেতু এখানে এক পক্ষ যে কেবল সংখ্যা আর শক্তিতে বেশি তাই নয় বরং তাদের পক্ষ থেকে নানা রকম ভয়-ভীতি ও ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া যুক্তি দিয়ে সত্যটা বুঝিয়ে দিলেই তারা তা মেনে নেবে এমন ধারনা করাই যায় না। বরং তাতে

আরো বেশি বেজার হয়ে কঠিন সাজার আয়োজন করবে তা বলাই বাহুল্য। একারণে জালিম শাসকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আসলেই বেশ কঠিন কাজ। একারণেই রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو أمير جائر

সর্বোত্তম জিহাদ হলো, জালিম শাসকের সামনে অথবা জালিম নেতার সামনে সত্য কথা বলা। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

বেশিরভাগ লোকই এধরণের সর্বোত্তম কাজ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকেন আর যত ধরণের নিকৃষ্ট কাজ আছে তা অবলিলায় করে চলেন। তাই তো আমরা দেখি বর্তমান যুগের ওলামা হজরতরা সদা সর্বদা শাসক শ্রেণীর মনতুষ্টি করার জন্য তৈরী থাকেন। শাসক শ্রেণী যেটা অপছন্দ করে তারা তার বিপরীতে ফতোয়াবাজী করেন আর শাসক যা পছন্দ করে তারা তার পক্ষে জয়গান গাইতে থাকেন। এভাবে জেল জুলুমের ভয়ে তারা তাগুতের পায়ে সদা সর্বদা তেল মাখিয়ে চলেন।

শাসক শ্রেণী যাদের জঙ্গী আখ্যা দিয়ে জেল জুলুমের শিকারে পরিণত করে, ওলামা হজরতরাও তাদের জঙ্গী আখ্যায়িত করে ফতোয়াবাজী করেন। চোখ বুজে বলে দেন এসব ইসলামে নেই। এটা প্রকৃতই ইসলামে আছে কিনা সেটা কিতাব খুলে দেখেন না। অথচ এদেরই কাউকে নিকাহ-তালাকের ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলে বিনিতভাবে বলে,

- আমাকে একবার মুতালায়া' করতে হবে।

তারপর বই-পত্তর খুলে বেশ খানিকক্ষণ পড়াশুনা করার পর রায় ঘোষণা করে। এটা অত্যন্ত ভাল একটা গুণ। সব কিছু বারংবার দেখে বলাটাই উচিৎ। কিন্তু জঙ্গীবাদের বিপরীতে ফতোয়াবাজী করার আগে একবারের জন্যও তারা ফতোয়ার কিতাব খুলে দেখেছেন কি? কেবল এই একটি ক্ষেত্রে তাদের সকল নিয়মকানুনই যেনো উল্টো। সরকার বাহাদুরকে সন্তুষ্ট করাটাই যেনো মুখ্য উদ্দেশ্য, কিতাবে কি আছে না আছে তা জানা নিষ্প্রয়োজন।

এভাবে বিশ্বের কাফির শক্তি এবং তাদের দোসর দেশী তাগুতী সরকারের সাথে একজোট হয়ে আমাদের ওলামা

হজরতরা যে মহাজোট গঠন করেছেন, তার কাছে গুটি কয়েক জঙ্গীর মোকাবিলা সংখ্যা-শক্তি বা যুক্তিতর্ক ইত্যাদি সব দিক থেকেই অসম। তাই তো জঙ্গীবাদের পক্ষে দু'পাঁচটা কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও মানুষ ভয়ে সেটা বলতে পারে না। তবে কথায় বলে, হক কথা টক করে বলে ফেলতে হয়। সেই মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই আমি এখানে এই অসম বিতর্কের অবতারণা করতে চায় এবং তার সুষম সমাধানও ঘোষণা করতে চায়। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জিহাদ করছে, দেশে-বিদেশে কাফির শক্তির বিরুদ্ধে সসস্ত্র সংগ্রাম করছে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা আসলেই সন্ত্রাসী বা খুনি হিসেবে গণ্য নাকি বীর মুজাহিদ হিসেবে গণ্য দলীল প্রমাণের আলোকে সেটাই প্রমাণ করতে চায়। তারপর কেউ চাইলে আমার কথা মানতেও পারেন না চাইলে নাও মানতে পারেন। সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। সে ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কেবল তাকেই প্রশ্ন করা হবে, উত্তরটাও তাকেই দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

দলছুট পোলাপান

উপরে আমরা বলেছি, বর্তমান যুগের ওলামা হজরতরা একমত হয়ে জঙ্গীবাদের পিছনে লেগেছে। হানাফী, সালাফী, দেওবন্দী, মাদানী, শিয়া, সুন্নী, মাজার পুজারী ও গাঁজা সেবী ফকীর ইত্যাদি সর্ব প্রকারের মানুষের মুখে একই কথা, "শান্তির ধর্ম ইসলামে জঙ্গীবাদের কোনো স্থান নেই"। সাধারন মুসলিমদেরও কোটিতে কটা বাদে বাকী সবাই ওলামায়ে দ্বীনের এই মতামতকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছেন। ফলে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে পুরো মুসলিম উম্মাহ যে বৃহত্তর ঐক্যজোট গঠন করেছে অন্য কোনো ব্যাপারে সে ধরনের ঐক্যমত পাওয়াই যায় না। এমনকি মাজার পূজার মতো শেরেক-কুফরের বিরুদ্ধেও এমন ঐক্যমত পাওয়া যায় না। এদের বিপরীতে অতি নগন্য সংখ্যক অল্প বয়স্ক যুবক জঙ্গীবাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। পূর্বের দলটির তুলনায় তাদের সংখ্যা এতটাই নগণ্য যে অনায়াসে তা শূন্য হিসেবে গণ্য করা যায়। এমতাবস্থায় বাঘা বাঘা সব ওলামা হজরতদের ঐক্যমতকে উপেক্ষা করে নগণ্য সংখ্যক দলছুট

পোলাপানের পক্ষ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করার কোনো মানে হয় কি? শুকনো ডাঙায় নৌকা চালানোর কোনো প্রয়োজন আছে কি?

আসলে পূর্বের গোটা বিশেক সাদা পৃষ্টা কালো করে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টাই করেছি। এখানে সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি সহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি, কোনো এক পক্ষে সংখ্যা বা শক্তি বেশি হলেই আমাকে কোনোরূপ চিন্তা গবেষণা না করে চোখ বুজে সে দলে যোগ দিতে হবে এটা কাপুরুষ ও নির্বোধ শ্রেণীর লোকদের স্বভাব। বেশিরভাগ লোকই এ স্বভাবের। কিন্তু আমরা একটু ব্যতিক্রমী হতে চায়। ধরে নিচ্ছি জঙ্গীবাদ আসলেই খারাপ আর সে কারণেই ওলামা হজরতরা তার পিছনে লেগেছেন। তবু আমরা জঙ্গীবাদের বিপক্ষে কথা বলার পূর্বে নিজেরা গবেষণা করে দেখে নিতে চায় এটা আসলেই খারাপ কিনা। এ ক্ষেত্রে অন্ধভাবে হুজুরদের অনুসরণ করা আমাদের নিকট শোভনীয় মনে হয় না। বুদ্ধিমান মানুষ

এমনিতেই কাউকে অন্ধ অনুসরণ করে না। তার উপর বর্তমান যুগের ওলামা হজরতদের উদ্ভ্রান্ত আচরণ দেখলে তাদের অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। কয়েকটা পয়েন্টে এই সব সন্দেহজনক আচরণের ফিরিস্তি তুলে ধরা যায়।

ক. নাস্তিক-মুরতাদ ও তাগুতী শক্তির সাথে সহমত এবং তাদের সঙ্গী করেই জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজীতে লিপ্ত হওয়া।

সাধারনভাবে মানুষ এটা আশা করে যে, হকের পক্ষে যে কথা বলবে সে নিজে হকপন্থী হবে। তাই যদি দেখা যায় কাফির-মুশরিক আর নাস্তিক মুরতাদ ও অন্যান্য বাতিল পন্থীদের সাথে মিলে কেউ হক কথা বলছে তবে তার কথা যতই হক হোক না কেনো চোখ কান খোলা আছে এমন মানুষ তাতে কিছুটা সন্দেহ না করে পারে না। মনে একটা প্রশ্ন জাগে। হুজুরদের কথাই যদি ইসলাম সম্মত হবে তবে সেটা দ্বীন ইসলামের শত্রু নাস্তিক মুরতাদ ও তাগুতী শক্তির মনমতো হয় কিভাবে? বিষয়টা বাঘে মোষে এক ঘাটে জল খাওয়ার মতো আজগুবী হয়ে যায়

না!

এছাড়া আরও একটা প্রশ্ন এখানে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর তা হলো, যখন দুজনের কথা একই রকম হয় তখন আমরা বুঝতে পারি তাদের একজন অন্য জনের কাছে কথাটা শিখেছে। একে অপরের কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করে দুনিয়ার তাবত তাগুতী শক্তি আর সকল বুযুর্গানে দ্বীন একই কথা বলছে এটা প্রায় অসম্ভব। অতএব, ইসলাম শান্তির ধর্ম, এখানে জঙ্গীবাদের কোনো অস্তিত্ব নেই এই মতবাদটির ব্যাপারে যেহেতু কাফির মুশরিক ও নাস্তিক মুরতাদরা আলেম ওলামাদের সাথে একমত হয়েছে সুতরাং প্রশ্ন জাগে দুটি দলের মধ্যে কে কার কাছে শিখলো? তাদের মধ্যে কে শিক্ষক আর কে ছাত্র? অনেকে হয়তো বলবেন, একদিকে আলেম ওলামা আর অন্য দিকে তাগুতী সরকারের নেতা গোতারা। এই দুটি দলের মধ্যে কে কার শিক্ষক হতে পারে তা তো অত্যন্ত স্পষ্ট একটা ব্যাপার। আলেমগণই যে এখানে শিক্ষক আর তাগুত সরকার তাদের ছাত্র সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ করা চলে? আমাদের অবশ্য কিছুটা সন্দেহ হয়।

কারণ শিক্ষক আর ছাত্র চেনার কিছু মূল নীতি আছে। সেই মূলনীতির আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে কথাটা ভুল প্রমাণিত হয়।

প্রথমেই মূলনীতিটি বোঝানোর জন্য একটা ঘটনা বলি। ইবনে হিশাম ﵀ বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে সাথে নিয়ে হিজরত করে প্রথম যেদিন মদীনাতে পৌঁছালেন আনসার সাহাবীরা দুজনের মধ্যে কে যে আল্লাহর রসুল তা চিনতে পারছিলেন না। তখন হঠাৎ রোদ দেখা গেলে আবু বকর ﵁ চাদর দিয়ে আল্লাহর রসুলকে ছায়া দিলেন। তৎক্ষনাৎ সবাই বুঝে গেলো যাকে ছায়া দেওয়া হচ্ছে তিনিই আল্লাহর রসুল আর যিনি ছায়া দিচ্ছেন তিনি তার সাহাবী বা ছাত্র।

এই মূলনীতিটি বোঝার মতো বুদ্ধি যদি কারো ঘিলুর মধ্যে থাকে তবে বর্তমান যুগের ওলামা হজরত আর কাফির মুশরিক এবং তাগুতী শাসকদের মধ্যে কে কার শিক্ষকের স্থানে তা বুঝতে তার বেগ পাওয়ার কথা নয়। কে কার মাথায় ছাতি ধরে আর কে কার পায়ে তেল মাখায় সেটা কি আর গোপন খবর! কাফির মুশরিকরা

যখন কোনো প্রতিনিধি পাঠায় তখন সেই প্রতিনিধির সামনে কারা মাথা গুজে বসে থাকে সেটা কি কারো অজানা!

জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যত কথা হুজুররা বলেন তার সবই যে আসলে বিশ্ব কাফির শক্তি আর তাদের দোসর ক্ষমতাশীন তাগুতী শাসকেরা হুজুরদের শিখিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে চলছে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। এই প্রমাণ আরও বেশি সুস্পষ্ট হয় যখন দেখি জঙ্গীবাদের বিপক্ষে কথা বলার সময় কেবল হুজুররা কিতাব পত্র থেকে কোনো দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেন না। চার মাজহাবের মতামত কি সেটাও বলেন না। কেবলই উস্তাদের নিকট শেখা কথাগুলো তোতা পাখির মতো আওড়িয়ে যান। এতে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায় আলেমরা আসলে এলেমের কারণে নয় বরং জালেম শাসকের নিকট দীক্ষা নিয়েই এসব ফতোয়া দিয়ে বেড়ান। এটা একটা নিশ্চিত বিষয় যা নিয়ে সন্দেহ করা চলে না। তবু আমরা নিশ্চয়তা দেবো না। বরং বলবো আমাদের সন্দেহ হয়। ওলামাগণ কিতাবাদি খুলে

পড়াশুনা করে এবং জেনে বুঝে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বলছেন নাকি কাফির-মুশরিকদের যা বলতে শুনেছেন চোখ কান বুঝে তাই বলে চলেছেন এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় বলেই আমরা বিষয়টা একটু যাচাই করে দেখতে চাই। বিজ্ঞ পাঠক আশা করি আমাদের এতটুকু অধিকার স্বীকার করবেন।

খ. দুনিয়ার বাঘা বাঘা আলেম-ওলামাদের বিপরীতে গোটা কয়েক দলছুট যুবকই যে হকপন্থী হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ হওয়ার আরও একটা কারণ হলো উভয়ের আচরণ।

বিষয়টা হলো, মৌলভীরা যে লোভী প্রকৃতির এবং দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা যে রবের দ্বীন বেঁচে কিনে খায় সেটা আমরা সবাই জানি। পেটের দায়ে মাদ্রাসার শিক্ষকররা ভিক্ষুকের বেশে বিত্তশালীদের কাছে যাওয়া আশা করে। মা'সুম বাচ্চাদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করে। রসিদ হাতে রাস্তা-ঘাট ও হাট-বাজারে হাজার হাজার লোক ছড়িয়ে দিয়ে টাকা কালেকশন করা হয়। কখনওবা রাস্তায় মাইক ভিড়িয়ে পথচারীদের নিকট

সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখা যায়। ওয়াজের মাঠের বক্তা আগে থেকেই চড়া পারিশ্রমিক ঠিক করে তাই ওয়াজ করতে আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কিছু অগ্রীমও গ্রহণ করে। খাবার মেনু কি হবে সেটাও ঠিক করে দেয়। এই প্রকার নিচ ও হীন পন্থা ছাড়াও সম্পূর্ণ হারাম পন্থাও অবলম্বন করা হয়। এতীমের নামে আসা সাদকা কৌশলে হুজুররা নিজেরা খেয়ে নেয়। মাদ্রাসায় ছবি ঝুলায়, শহীদ মিনারে (!!) মাল্যদান করে। রাজনীতি যারা করে সেসব হুজুররা গাজ-বাজনার আসরে গমন করে। এমনকি ভাঙা মন্দির পরিদর্শন করে সংস্কারের অঙ্গীকার করে। এরকম আরো কত অঘটন যে তারা ঘটায় তার গোনতি নেই। যতটুকু কেতাব-কলম শিখেছেন তা দিয়ে কেবলই দুনিয়া কামাই করার চেষ্টা করেন। সমাজপতিদের সামনে গিয়ে জোড় হাত করে দাড়িয়ে থাকেন। দু'একটা পয়সা ছুড়ে দিলে সেটা কুড়িয়ে এনে সংসার চালান। দ্বীনের জন্য কখনও কোনো ত্যাগ সহ্য করেছেন কিনা সেটা বলা মুশকিল।

বিপরীত দিকে দলছুট পোলাপানদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা নিজেরা কোটিপতি বা কোটিপতিদের সন্তান, উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত। ধনী বাবার বখে যাওয়া সন্তান নয়। কারো নিকট ধরনা না দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সামর্থ তাদের ছিল। এছাড়া মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সর্বশ্রেণীর লোকই তাদের মধ্যে আছে। তাদের সবার মূল বৈশিষ্ট হলো আল্লাহর দ্বীন মানার ক্ষেত্রে তারা কোনো আপোস করে না। শত ভয় এবং বাধা উপেক্ষা করে তারা দ্বীন মানতে প্রস্তুত। দ্বীন কায়েমের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত। তাদের কাউকে যখন পুলিশ গ্রেফতার করে সে বলে, আমাকে এখনই মেরে ফেলো আমি জান্নাতে যেতে চাই। অথচ ফতোয়াবাজ হুজুররা হাজার বছর বেঁচে থাকতে চায়। যৌবনে তো নয়ই এমনকি বুড়ো থুতথুরে অবস্থায়ও তারা মরতে চায় না। এই দুটি দল কখনও সমান হতে পারে না! সত্যি বলতে কি যখন দেখি একজন ব্যক্তির চারিদিকে পুলিশে ঘিরে আছে আর তার হাতে পায়ে শিকল বাধা আছে। এসব কিছু উপেক্ষা করে সে তৃপ্তির হাসি হাসছে আর জিহাদী গজল গাচ্ছে। তখন মনটা কেমন জানি মুগ্ধ হয়ে

যায়। বিপরীতে যখন দেখি একুশের মিছিলে ব্যান্ডের বাজনার তালে তালে হুজুররা শহিদ (!!) মিনারে পুষ্প প্রদান করতে যাচ্ছে তখন সারাটা দেহ ভীষণ যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়। কি করে বলি এরাই সঠিক পথে আছে আর ওরা দলছুট? আমি দুঃখিত। এমন জুলুম আমি করতে পারবো না। হারামখোর হুজুর হকপন্থী আর দুনিয়ার সকল আরাম পরিত্যাগ করে যে দ্বীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দিলো সে বাতিলপন্থী? কেনো জানি একথা আমার বিশ্বাস হতে চায় না। আমি যদি ভুল করি তবে আল্লাহ যেনো আমাকে ক্ষমা করেন।

উভয়ের তুলনাটা একটা সত্য কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। আব্দুল্লাহ আজ্জাম ﵀ উল্লেখ করেন। সায়্যেদ কুতুবকে যখন ফাসিতে চড়ানো হবে তার আগে একজন মোল্লাকে পাঠানো হয় তাকে কালেমা পাঠ করানোর জন্য। সায়্যেদ কুতুব ﵀ তাকে তিরষ্কার করে বলেন,

- তুমি যে কালেমা পাঠ করো তার বদলে তোমার রুটি রুজি হয় আর আমি যে কালেমা পাঠ করি তার কারণে আজ আমার ফাঁসি হচ্ছে।

বর্তমানে সেই একই চিত্র আমরা লক্ষ্য করছি। সার্থান্বেষী হুজুররা দ্বীন বেঁচে দুনিয়া গড়ছে আর দলছুট কিছু যুবক দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়া ত্যাগ করছে। উভয়ে কি এক হতে পারে? সত্যি বলতে কি হুজুরদের কর্মকান্ড যখনই কাছ থেকে লক্ষ্য করি আর তাদের সাথে এই দলছুট যুবকদের কর্মকান্ড মিলিয়ে দেখি আমার নিকট প্রথম দলটিকে শয়তান আর পরের দলটিকে ফেরেস্তা বলে মনে হয়।

অতএব এক পাল হুজুর গুজুর গুজুর করে ফতোয়া দিলেই আমি তাদের পক্ষ নিয়ে নিষ্ঠাবান একদল যুবককে তিরষ্কার করে নিজের আখিরাতকে নষ্ট করবো অত বোকা আমি নই। এতে মানুষ আমাকে যা খুশি তাই বলুক।

এতসব কারণেই তথাকথিত বুযুর্গানে দ্বীনের উপর আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। তাই তারা একমত হয়েও কোনো কিছু বললে সেটা চোখ বুজে মেনে নেওয়ার বদলে দলীল প্রমাণ খুঁজে দেখা ছাড়া আমাদের অন্তর প্রশান্তি পায় না। যারা এতদূর কষ্ট না করে অন্ধের মতো

এসব বুযর্গদের কথা মেনে চলেন আর তারই উপর নির্ভর করে একদল মুসলিম সম্পর্কে অত্যন্ত বাজে মন্তব্য করেন রোজ হাশরে আল্লাহর নিকট কি জবাব দেবেন সেটা তাদের এখনই ঠিক করা উচিৎ। তারা হয়তো বলবেন,

- হে আল্লাহ আমরা ওলামা হজরতদের কথা অন্ধভাবে মেনে চলেছি।

আল্লাহ যদি তখন বলেন আমিতো আগেই বলেছি,

أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

হে ঈমানদাররা নিশ্চয় বহু সংখ্যক পন্ডিত ও বুযর্গরা জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে আর আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। [সূরা তাওবা/৩৪]

তোমরা সেই সব ভন্ড হুজুরদের থেকে কেনো সাবধান হওনি?

তখন কি কিছু বলার থাকবে? তাই বলি অন্ধভাবে

হুজুরদের পিছনে না ঘুরে কিছুটা পড়াশুনা করুন। হক বাতিলের প্রশ্নে আন্দাজে কিছু না বলার চেয়ে জেনে বুঝে মুখ খোলাই অধিক নিরাপদ নয় কি?

গ) তৃতীয় যে কারণে ওলামা হজরতদের উপর আমরা সন্দিহান হয়ে উঠেছি তা হলো, এক্ষেত্রে তাদের পলায়নপর আচরণ। প্রায়ই আমরা দেখি, কোনো সালাফী সামান্য একটু শব্দ করে জোরে আমীন বললে হুজুররা হুংকার ছেড়ে তার সাথে বিতর্কে লেগে যায়। সালাফীরাও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলে, ঈদের ছয় তাকবীর বা তারাবীর বিশ রাকাত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস দেখাতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরষ্কার। এধরনের তর্ক বিতর্কের ঠেলায় অনেক মসজিদে নামাজ পড়ার পরিবেশই থাকে না। কিন্তু এই সব তর্কবাগীশ ওলামা মাশায়েখরা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় কেবলই এক তরফা ফতোয়াবাজী করেন। কখনও তো জঙ্গীদের বিতর্ক করতে ডাকেন না? তারা যা করছে সে ব্যাপারে তাদের কোনো দলীল প্রমাণ আছে কিনা সেটাও তো একবারও জিজ্ঞাসা করেন না? এর অর্থ কি এই যে তারা তাদের

ভয় পান? কিন্তু কিসের ভয়? কেউ হয়তো বলবেন,

- ওনারা ভয় পান যদি জঙ্গীরা আত্মঘাতি হামলা করে।

এটা অবশ্য বেশ যৌক্তিক কথা। জঙ্গীদের আবার স্বভাব খারাপ। যেখানে সেখানে হামলা করে বসে। বিপরীতে আমাদের নিরীহ ওলামা মাশায়েখদের হার্ট বেজায় দুর্বল। হামলা কখন হবে না হবে তার আগেই তারা কাপড় নষ্ট করে ফেলেন। সুতরাং এভাবে তো আর বিতর্ক চলতে পারে না। কিন্তু এতেই কি পার পাওয়া যাবে? সামনাসামনি বসতে না পারেন দু একটা চিঠি লিখে তো তাদের সাথে আলাপচারিতা করতে পারেন। নাকি সেখানে আবার অন্য ভয় আছে? জঙ্গীদের সাথে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের খবর প্রকাশ হলে সরকার বাবাজী রাগ করবে এমন ভয় আছে তাই যতদূর সম্ভব তাদের থেকে দূরে থাকায় ভাল মনে করেন? সেক্ষেত্রে তো আবারও প্রমাণিত হয় ওনারা আসলে হক বাতিলের পার্থক্য নিরুপণ করার জন্য নয় বরং কেবল তাগুত সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

তবে যে যাই বলুক ওলামা হজরতদের আসল ভয় কিন্তু অন্য জায়গায়। তর্কের মজলিসে আত্মঘাতি হামলা হবে এটা সঠিক চিন্তা নয়। আর সরকারের অনুমতি নিয়ে জঙ্গীবাদের নিন্দা করে একটা চিঠি লিখে তা জঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে তার উত্তরে তারা কি লেখে সেটা বোঝার চেষ্টা করলে সরকার দেশব্যাপী হুজুর বিরোধী অভিযান শুরু করবে সেটাও সঠিক নয়। আসল ভয় হলো, বিতর্কে হেরে যাওয়ার ভয়।

আলেম ওলামারা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যেসব ফতোয়া দেন সেগুলোকে ভিক্ষুকের ঝুলার সাথে তুলনা করা যায়। ভিক্ষুকরা একটা ঝুলার গায়ে হাজারটা নানা রঙের তালি পট্টি লাগিয়ে রাখে। ঝুলাটির এই বেহাল অবস্থা দেখে কারো অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয় এবং যতটা বেশি সম্ভব দান করে। পট্টি ওয়ালা ঝুলায় দান বেশি পড়ার কারণে শুনেছি অনেক ভিক্ষুক নতুন ঝুলার ওপর ইচ্ছা করেই তালি পট্টি মেরে ভিক্ষা করতে বের হয়। এভাবে হাজার হাজার পুরোনো কাপড়ের পট্টির আড়ালে নতুন ঝুলাটি

প্রায় ঢেকে যায় বা পুরাই গায়েব হয়ে যায়। ঝুলাতে পট্টি দেখে কারো অন্তরে প্রথমে দয়ার সঞ্চার হলেও সম্পূর্ণ ঘটনা শুনলে সবাই যে প্রথমে হাসবে আর পরে রেগে যাবে সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। জঙ্গীবাদের বিপরীতে হুজুররা যেসব ফতোয়া দেন সেসবও এভাবেই তালি পট্টি মেরে তৈরী করা। ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি এসব ফতোয়া শুনে প্রথমে না হেসে এবং শেষে না রেগে পারেন না। ইসলামের প্রকৃত রূপটাকে নানা রকম তালি পট্টির আড়ালে ঢেকে ফেলে ফতোয়াবাজী করেন আমাদের ওলামারা। পবিত্র কুরআনের আগে পরের আয়াতগুলো বাদ দিয়ে আচমকা একটা আয়াত উল্লেখ করেন। হাদীসের ক্ষেত্রেও তাই। কখনও আবার সম্পূর্ণ একটি আয়াতের বদলে আয়াতের সামান্য একটু অংশ উল্লেখ করেন। উদাহরণস্বরুপ, একটি আয়াতে মহান আল্লাহ তার রসুল এবং সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, (أشداء علي الكفار رحماء بينهم) তারা

কাফিরদের উপর কঠোর আর মুমিনদের উপর দয়ালু। [ফাত্হ/২৯]

হুজুররা কেবল দয়ালু অংশটুকু উল্লেখ করেন আর কঠোর কথাটুকু এড়িয়ে যান। একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ অনেকগুলো বিশেষণের মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে, (ونبي الرحمة ونبي الملحمة) আমি দয়ার নবী আর আমি যুদ্ধের নবী। [মু'জামে আওসাত, মুসনাদে আহমাদ] হুজুররা কেবল বলেন, তিনি দয়ার নবী, যুদ্ধের নবী কথাটা মুখে উচ্চারণ করার সাহসই তাদের হয় না। একটা আয়াত তারা খুব বেশি বেশি পাঠ করেন,

{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}

আমি তো আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। [আম্বিয়া/১০৭]

এর মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, রসুলুল্লাহ ﷺ কাফির-মুশরিক, মুমিন-মুসলিম সকল মানুষের উপর

দয়া দেখানোর জন্য দুনিয়ার বুকে এসেছেন। অতএব, তাদের কারো উপর হামলা করা বা কাউকে আঘাত করা বা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তার বৈশিষ্ট্য নয়।

অথচ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসুল। আর নামাজ পড়ে, যাকাত দেয়। যখন তারা এসব করবে আমার নিকট থেকে তাদের জান ও মাল রক্ষা পাবে। [বুখারী ও মুসলিম]

এছাড়া মুসলিম শরীফের একটি লম্বা হাদীসে এসেছে, কাফিরদের বলা হবে হয়তো মুসলিম হও অথবা জিজিয়া কর প্রদান করো অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

এছাড়া আরও অনেক দলীল প্রমাণ রয়েছে যার সব

এখানে উল্লেখ করলে পাঠক হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠবেন। হুজুররা তো সেসব আয়াত ও হাদীস একবারও পাঠ করে না। এসব গোপন করে তারা এদিক সেদিক থেকে দু একটা আয়াত বা হাদীস তুলে এনে তালী পট্টি মেরে ফতোয়াবাজী করেন। তাদের অবস্থা হুবহু ইহুদীদের মতো যারা সামাজিক চাপে জেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করার বদলে কেবল বেত্রাঘাত করতো আর মানুষের সামনে অপমান অপদস্ত করতো। আমাদের দেশে অনেক সময় মাথা নেড়া করে দেওয়া বা মাথায় ঘোল ঢেলে দেওয়া ইত্যাদি যা কিছু করা হয় তারই মতো। একবার তারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে জেনাকারীর শাস্তি কি তা জানতে চাইলো। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাওরাতে কি লেখা আছে? তারা বললো, (نفضحهم ويجلدون) তাদের অপদস্ত করতে হবে এবং বেত্রাঘাত করতে হবে। তখন তিনি তাদের তাওরাত নিয়ে আসতে বললেন। তারা তাওরাত নিয়ে এসে

যেখানে পাথর মেরে হত্যার করার কথা লেখা আছে সেখানটায় হাত দিয়ে ঢেকে রেখে আসেপাশে পড়তে লাগলো। তাদের হাত সরিয়ে দিতেই দেখা গেলো জেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে। এই ঘটনা সম্পূর্ণ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে।

খুবই আশ্চর্য যে, সেদিন ইহুদীরা আল্লাহর কিতাব তাওরাতের সাথে যে আচরণ করেছিল হুজুররা আজ আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআনের সাথে একই আচরণ করছে। কিছু আয়াতকে গোপন করে বাকী আয়াতগুলো মানুষকে শোনাচ্ছে যাতে তাদের সহজে বিভ্রান্ত করা যায়। এধরণের জাল জোচ্চুরীর আশ্রয় গ্রহণ করছে বলেই তারা সদা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে কখন হয়তো গোমর ফাঁস হয়ে যায়। তাইতো এক তরফাভাবে কেবল ফতোয়াবাজী করেই চলে কখনও বিতর্কে ভিড়তে চায় না। একবার ভাবুন তো যদি বিতর্কের মাঠে ঐসব হাদীসগুলো ফাঁস করে দেওয়া হয় তবে কি হুজুরদের

মান থাকবে? তাইতো এক পাল হুজুর কয়েকজন দলছুট পোলাপানের সাথে বিতর্কে বসতে রাজি হয় না। কেবল মসজিদের মেম্বারে আর খোলা মাঠে মঞ্চের উপরে এক তরফাভাবে ফতোয়াবাজী করে চলে। মুর্খ জনগন তার পক্ষে, ধূর্ত তাগুতী সরকারও তার পক্ষে। অতএব, তার কথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা কারও নেই। অতএব, সে যা খুশি বলতে পারে। ইচ্ছা করলেই সে সেখানে সাদা রঙের কাকের বাচ্চা প্রসব করতে পারে। কারো কিছু বলার ক্ষমতা নেই। এরকম নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও যদি কোনো বীর পুরুষ বুকে সাহস সঞ্চার করে হুজুরের কোনো কথার প্রতিবাদ করে এবং কিছু দলীল প্রমাণ উত্থাপন করে তবে দলীলের বিপরীতে দলীল পেশ করার বদলে সে ভয় দেখিয়ে বলে,

- এখানে কিন্তু আমার প্রশাসনের ভাইয়েরা আছে।

মহান আল্লাহ কত সুন্দর বলেছেন,

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه

মহান আল্লাহই কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? আর তারা কিনা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভয় দেখায়। [যুমার/৩৭]

আবু জেহেল বলেছিল, আমি আমার লোকদের ডাকবো। মহান আল্লাহ বলেন,

فليدع ناديه سندع الزبانية

সে তার লোকদের ডাকুক আমিও জাহান্নামের ফেরেশতাদের ডাকবো।

[আলাক/১৭,১৮]

হুজুরদের এহেন আচরণ দেখে আমাদের মনে হয় সংখ্যায় বা শক্তিতে তারা যতই বেশি হোক দলীল প্রমাণে ভীষণ দূর্বল। আর সে কারণেই তাদের ফতোয়াবাজীতে প্রতারিত না হয়ে প্রকৃত ঘটনা একটু তলিয়ে দেখাটাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। সেই সাথে আমাদের মনে একটু সাহসও সঞ্চারিত হয়। স্পষ্টত বুঝতে পারি সংখ্যায় ও শক্তিতে কম হলেও ছোট দলটি দলীল প্রমাণে বেশ সবল। সুতরাং বিতর্কটা যতই অসম হোক তাতে জয়ী

হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কম নয়। সেই সাহস বুকে নিয়েই আমরা এবার এই অসম বিতর্কে অবতীর্ণ হতে পারি।

শয়তানের গেঁরো

একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষ যখন ঘুমায় শয়তান তার ঘাড়ে তিনটি গেঁরো দেয়। যদি সে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তবে একটি গেঁরো খুলে যায়, যখন সে ওজু করে তখন দ্বিতীয়টি খুলে যায় এরপর নামাজ পড়লে তৃতীয়টিও খুলে যায়। বুখারী ও মুসলিমে হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

এভাবে একাধিক গেঁরো দেওয়ার বিষয়টি কিন্তু বেশ যৌক্তিক। মানুষ যখন কোনো কিছুকে শক্ত করে বাঁধতে চায় তখন তাতে যত বেশি সম্ভব গেঁরো দেয়। বিশেষ করে যদি জানে যাকে বাঁধা হচ্ছে সে খুব শক্তিশালী আর যা দিয়ে বাঁধা হচ্ছে সেটা দূর্বল তখন তড়িঘড়ি করে কতগুলো যে প্যাঁচ দেয় আর কটা যে গেঁরো বাঁধে তার গোনতি থাকে না। একজন জঙ্গীকে হাতে পায়ে বেড়ি

বেধে যখন গোটা বিশেক পুলিশ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে নিয়ে যায় তখন বিষয়টা কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

শয়তান ভালভাবেই জানে যে, সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার বন্ধন অত্যন্ত দূর্বল আর তাই সে একটি গেঁরো দিয়ে যথেষ্ট মনে করে না বরং একের পর এক গেঁরো দিয়ে বন্ধনকে শক্ত করতে চায়। এ যুগের হুজুররা সাক্ষাত শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নানা রকম প্যাঁচ লাগিয়ে তারা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের চেষ্টা করছেন। তারা খুব ভাল করেই জানেন নিরোপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর যে কোনো বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য চিন্তা করলেই তাদের এই কৌশল ধরে ফেলবেন। তাই তারা বিভ্রান্তির বন্ধনে একের পর এক হাজার খানেক গেঁরো লাগিয়ে রাখে যাতে সহজে কেউ নিষ্কৃতি না পায়। তবে মানুষ একটু চিন্তা ভাবনা করলেই কট কট করে গেঁরো গুলো কেটে যেতে থাকে। হুজুররা তড়িঘড়ি করে আরো কিছু গেঁরো বাঁধতে থাকে। নির্বোধ লোকেরা তাই সহজে তাদের কব্জা থেকে মুক্তি পায় না। তবে আল্লাহ যাকে মুক্তি দেন সে ঠিকই মুক্তি

পায়। জোরে একটা গা ঝাড়া দিলে কোথাকার গেঁরো যে কোন দিকে ছিটকে পড়ে তার ঠিক থাকে না। পুরা মুসলিম উম্মা কবে যে এভাবে একটা গাঁ ঝাড়া দেবে আমরা তারই অপেক্ষাই আছি। আল্লাহ যেনো সে সুদিন চর্মচক্ষে দেখে যাওয়ার তৌফিক আমাদের দান করেন। আমীন।

যাই হোক, লড়াইয়ের আগে যেমন দূর থেকে প্রতিপক্ষের হাব ভাব ভালভাবে দেখে নিতে হয় তেমনি বিতর্ক শুরু হওয়ার আগেই মোল্লাদের শয়তানী গেঁরো সম্পর্কে পাঠকের কিছুটা ধারনা থাকা উচিৎ বলে আমার মনে হচ্ছে। একারণে নিম্নে আধুনা যুগের হুজুরদের শয়তানী গেঁরোর কিছু নমুনা পেশ করা হলো।

হুজুররা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে গেঁরো লাগাই তার আকার আকৃতি ও প্রকার প্রকৃতি নির্ভর করে মানুষটির বুদ্ধিমত্তার উপর। যারা মুর্খ ও নির্বোধ তাদের ক্ষেত্রে খুব সহজ একটা গেঁরো দেওয়া হয়। সোজা সাপটা বলে দেওয়া হয়,

- ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ বলে

কিছু নেই। রসুলুল্লাহ ﷺ কখনও কোনো মানুষ হত্যা করেন নি। মানুষ মেরে ইসলাম কায়েম হয় না ইত্যাদি।

এই সহজ গেঁরোতেই বেশিরভাগ লোক ঘেরা খেয়ে যায়। ইসলামে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই এবং রসুলুল্লাহ ﷺ কখনও মানুষ হত্যা করেন নি এই জ্বলজ্যান্ত মিথ্যাটা সবাই হজম করে নেয়। কিন্তু যার মাথার ঘিলুতো কিছু পরিমাণ পুষ্টি আছে সে অবাক হয়ে বলে,

- ইসলাম ধর্মে যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই থাকবে তবে বদর, উহুদ, তাবুক, ইয়ারমুক এগুলো কি? এসব কি বনভোজনের নাম?

বনু কুরাইজার প্রশিদ্ধ ঘটনাটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তারা চুক্তি ভঙ্গ করলে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্বে মুসলিমরা তাদের উপর আক্রমণ করে। শেষে তারা সা'দ ইবনে মুয়াজকে বিচারক মেনে আত্মসমর্পণ করে। সা'দ ﷺ বিচার করেন,

أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم، يستعين بهن المسلمون

তাদের মধ্যকার পুরুষদের হত্যা করা হবে আর নারীদের বাচিয়ে রাখা হবে। মুসলিমরা তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করবে। [তিরমিযী]

তারপর এক দিনের মধ্যেই তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। তিরমিযীর বর্ণনাতে এসেছে, (كانوا أربع مائة) তাদের সংখ্যা ছিল চার শত।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বিন আশরাফ নামের এক ইহুদী মুসলিম মহিলাদের নামে কবিতা লিখতো আর কাফির মুশরিকদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করতো। একারণে রসুলুল্লাহ ﷺ একটা গোপন অভিযান প্রেরণ করেন যারা ঐ ব্যক্তিকে গোপনে হত্যা করেন। আবু রাফে' নামের এক ইহুদীর সাথেও একই আচরণ করা হয়। কিছু সাহাবাকে পাঠানো হয় যারা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে গুপ্ত হত্যা করে। দুটি ঘটনাই সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযী (كتاب المغازي) তথা যুদ্ধের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, সহীহ বুখারীর যুদ্ধ অধ্যায়। অর্থাৎ সহীহ বুখারীর মতো সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে যুদ্ধ অধ্যায় নামে আলাদা একটা অধ্যায়ই আছে। অথচ হুজুররা যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম থেকেই বের করে দিতে চান। অতএব এটাকে কেবল জোচ্চুরি না বলে পুরা পুকুর চুরিই বলা যায়।

যাই হোক হুজুররা কিন্তু এসব ঘটনা এখন আর উল্লেখ করেন না। ইহুদীদের মতো দু'হাত দিয়ে এসব হাদীস আড়াল করে রাখেন। কারণ এগুলো জঙ্গী হাদীস। হয়তো খুব শীঘ্রই তারা এসব জঙ্গী হাদীস বাদ দিয়ে নতুন করে হাদীস গ্রন্থ লেখার দাবীতে আন্দোলন করবেন। তখন জঙ্গীদের সাথে বিতর্ক করা তাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু সে সময় আসার আগ পর্যন্ত এসব হাদীসের একটা কিছু উত্তর তো দিতেই হবে তাই তারা এখানে আর একটা গেঁরো লাগানোর চেষ্টা করেন। জোর করে হেসে বলেন,

- আরে এসব যুদ্ধ বিগ্রহ তো হয়েছে আত্মরক্ষার জন্য। মুসলিমরা আগে আক্রমণ করে না, তবে

কাফিররা আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করে। এসব ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

প্রথম গেঁরোটি কট করে কেটে যাওয়ার পর এই দ্বিতীয় গেঁরোটি লাগানো হয়। যারা প্রথম গেঁরো পার হয়েছেন তাদের অনেকেই এই দ্বিতীয় গেঁরোতে আটকে যায়। কারণ শয়তানী চক্রের সাথে পেরে ওঠার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান তাদের নেই। সামান্য চিন্তা করলেই কিন্তু এই দ্বিতীয় গেঁরোটিও আগেরটির মতোই কট করে কেটে যাবে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কেনো হবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনটি দফা কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে যে কোনো একটা তাদের গ্রহণ করতে হবে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (فادعهم إلى ثلاث خصال) তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে ডাকো। এরপর তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন,

১. ইসলাম গ্রহণ করতে হবে।
২. জিজিয়া (এক ধরনের বাৎসরিক কর) প্রদান করতে হবে।
৩. উপরের একটিতেও রাজি না হলে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

পাঠক সামান্য চিন্তা করুন। যদি কাউকে বলা হয়, হয় মুসলিম হও অথবা আমাদের কর দাও নয়তো তোমার সাথে যুদ্ধ করবো। এটা আত্মরক্ষা বলে গণ্য হয় নাকি আক্রমণ করা বলে গণ্য হয়। এতটুকু বুদ্ধি যাদের নেই তাদের সাথে বিতর্ক করে লাভ কি? তাছাড়া আত্মরক্ষার জন্যই যদি যুদ্ধ হতো তাহলে প্রথমেই তো একথা বলা উচিৎ ছিল – আমরা শান্তি চায়। আমাদের উপর হামলা বন্ধ করলে আমরাও তোমাদের উপর হামলা বন্ধ করবো।

কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ একথা বলেন নি কারণ একথা বললে আল্লাহর বিধান অমান্য করা হয়। যেহেতু সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া

কর প্রদান করে। অতএব কাফির মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা কমপক্ষে জিজিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের অনুগত হতে বাধ্য করা হবে। এর বাইরে কোনো রাস্তা নেই। উম্মতে মুসলিমার সকল আলেম এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন। উপরে আমরা বলেছি, নিকে তালাকের ফতোয়ার সময় হুজুররা হেদায়, কুদুরী, ফতোয়া-ই শামী ইত্যাদি গ্রন্থের নাম বলে মুখ ফেনিয়ে ফেলেন। কিন্তু জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় একটিবারও এসব গ্রন্থের নাম মুখে আনেন না। কিন্তু কেনো? কারণ এসব বইতেও অনেক জঙ্গীবাদী কথা লেখা আছে। এই যেমন ধরুন হেদায়া কিতাবে বলা হয়েছে,

وقتال الكفار واجب " وإن لم يبدءوا للعمومات

কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা (মুসলিমদের উপর) আবশ্যিক দায়িত্ব যদিও তারা আগে শুরু না করে। যেহেতু যুদ্ধের আদেশ আমভাবে দেওয়া হয়েছে (কাফিররা আক্রমণ করলো কি করলো না তা শর্ত করা হয় নি)। [কিতাবুল জিহাদ]

শারহে বেকায়াতে বলা হয়েছে,

هو فرض كفاية بدأ أي ابتداء وهو أن يبدأ المسلمون بمحاربة الكفار

জিহাদ শুরুতেই ফরজে কিফায়া অর্থাৎ মুসলিমরাই কাফিরদের উপর আগে আক্রমণ শুরু করবে। [কিতাবুল জিহাদ]

ফতোয়া-ই শামীতে কাফিররা যুদ্ধ শুরু না করলেও যুদ্ধ করতে হবে এ সম্পর্কে লম্বা আলোচনা করা হয়েছে। যার মূল ভাষ্য হলো, শুরুতেই জিহাদ করা ফরজে কিফায়া আর কাফিররা আক্রমণ করলে তা ফরজে আইন হয়ে যায়। [কিতাবুল জিহাদ]

এগুলো সবই হানাফী মাজহাবের বড় বড় ফিকাহ গ্রন্থ। অন্যান্য মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থেও হুবহু একই কথা লেখা আছে। কাফিররা আক্রমণ করার আগেই তাদের উপর আক্রমণ করা ফরজে কিফাইয়া আর তারা আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করা ফরজে আইন এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সকল ওলামায়ে দ্বীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইমাম কুরতুবী ﵀ ইবনে আতীয়্যা ﵀ থেকে বর্ণনা

করেন,

والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

যে বিষয়ে ইজমা চলে আসছে তা হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিটি উম্মতের উপর জিহাদ সাধারনভাবে ফরজে কিফায়া। যদি একদল লোক আদায় করে বাকীদের উপর আর ফরজ থাকে না। আর যখন ইসলামের কোনো ভূমিতে শত্রু আক্রমণ করে তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়। [তাফসীরে কুরতুবী]

এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, কাফিররা আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করা ফরজে আইন আর তারা আক্রমণ না করলেও তাদের উপর হামলা করা ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ কাউকে না কাউকে এটা করতে হবে। তাহলে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়া যুদ্ধ হতে পারে না হুজুরদের এ কথা ধোপে টেকে কি? আল্লাহ না করুন আমার তো ভয় হয় হুজুররা আবার শেষ মেশ নিজেদের

মাজহাবের ইমামদেরই জঙ্গী সন্ত্রাসী ইত্যাদি বলে গালাগালি শুরু না করেন। একবার যে ভুল রাস্তায় চলতে শুরু করে তার উপর তো আর আস্থা রাখা যায় না।

যাই হোক, কুরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীনের বক্তব্যের আলোকে দ্বিতীয় গেঁরোটিও কট করে কেটে যায়। তবে হুজুররা কিন্তু এতো সহজে হাল ছাড়বেন না হারও মানবেন না। তারা আরো একটা গেঁরো লাগিয়ে দেবেন। বলবেন,

- এসব তো তখন যখন মুসলমানদের রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে। আল্লাহর রসুল মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে এসব করেন নি। অতএব, রাষ্ট্র প্রতিষ্টার আগে এসব করা যাবে না।

যুক্তিটাকে হুজুরগণ যতই শক্ত মনে করুন আসলে কিন্তু বেশ নড়বড়ে। রসুলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে যতটুকু এলাকার উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্টিত করেছিলেন তা কিন্তু রাশিয়া বা চীন এমনকি বাংলাদেশের মতো ছোট কোনো রাষ্ট্রের সমানও ছিল না। সেটা ছিল মদীনা নামক একটা শহরের অল্প পরিমাণ জায়গার উপর। বর্তমানে যারা কাফিরদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এতটুকু স্থান দখলে আছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক বা সিরিয়াতে বিস্তীর্ণ এলাকা মুজাহিদদের দখলে রয়েছে। সেখানে তারা ইসলামী ইমারাত বা দাওলাত প্রতিষ্ঠার ঘোষনাও দিয়েছে। যার অর্থ ইসলামী শাসন বা ইসলামী রাষ্ট্র। চালবাজ হুজুরদের নিকট সরাসরি প্রশ্ন হলো ঐ সব এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যে জিহাদ চলছে তারা সেটাকে সমর্থন করেন কিনা? কাপুরুষ হুজুররা কিন্তু একটি বারের জন্যই হ্যাঁ শব্দ উচ্চারণ করতে পারবেন না। তাদের সকল শর্ত পুরা করলেও তারা মুজাহিদদের পক্ষে কথা বলবেন না। কিন্তু শর্তের কিছুই পুরা না হলেও তাগুতী শাসকের পক্ষে ঠিকই কথা বলে যাবেন। এর মাধ্যমে এটাই প্রমানিত হয় যে, তারা আসলে ইসলামের বিধান নয় বরং কাফিরদের তৈরী সংবিধান মানতেই ফতোয়াবাজী করেন।

দেখা যাচ্ছে বিতর্কে জয়ী হওয়ার জন্য হুজুররা যত গেঁরোই দিক সামান্য চিন্তা ফিকির করলেই তা কটকট করে ছিড়ে যাবে। তাদের এসব কৌশল অনেকটা

মাকড়সার জালের মতো। দেখে বেশ জটিল মনে হয় কিন্তু একটা টান দিলে ছিড়ে ছুটে কোথায় চলে যায় তার ঠিক থাকে না। এরপর হয়তো তারা ফন্দি ফিকির করে আরো অনেক গেঁরো বাঁধার চেষ্টা করবে। কিন্তু বিজ্ঞ পাঠক একটু সতর্ক থাকলেই তা থেকে মুক্তির একটা উপায় করে নিতে পারবেন বলে আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ।

শান্তিতে রাখা আর শান্তিতে থাকা কি এক?

এবার আমরা সরাসরি বিতর্কের ময়দানে অবতীর্ণ হবো। বিতর্কের শুরুটা হতে হবে গোঁড়া থেকে। এখানে আসলে দুটি পক্ষ। এক দিকে শান্তিকামী হুজুররা অন্য দিকে উগ্রবাদী জঙ্গীরা। দুটি পক্ষই দাবী করছে তারা সঠিক ইসলামের উপর আছে। সবাই বলছে রসুলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করতে দুনিয়াতে এসেছেন এবং যে কাজ করে গেছেন তারা সেটাই করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানতে হবে তা হলো,

- রসুলুল্লাহ ﷺ কি উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে

এসেছিলেন? তার মিশনটা কি ছিল?

এর উত্তর অবশ্য হুজুরদের আগে থেকেই ঠিক করা আছে। অবলিলায় বলে ফেলবেন,

- তিনি দুনিয়াতে এসেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আর বিশ্ব বাসীর উপর দয়া দেখানোর জন্য।

এর স্বপক্ষে তারা এই আয়াতটি পেশ করবেন,

{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين }

আমি তো আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। [আম্বিয়া/১০৭]

পড়াশুনা যার একটু বেশি সে হয়তো ঐ হাদিসটিও পেশ করতে পারে যেখানে রসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله

যদি তোমরা বেঁচে থাকো তাহলে দেখবে একজন মহিলা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হিরা নামক এলাকা থেকে

ভ্রমণ করে কা'বায় আসবে এবং কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে। পথের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া সে আর কাউকে ভয় করবে না। [বুখারী]

অর্থাৎ চোর ডাকাত ইত্যাদি কোনো কিছুর ভয় থাকবে না। দুনিয়ার বুকে এমন শান্তিই রসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আর এমনি ভাবে সকল সৃষ্টির উপর দয়া প্রদর্শন করতেই তিনি দুনিয়াতে এসেছেন। অতএব, কারো সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঁধানো বা কোনো খুন খারাবী তিনি করতে পারেন না।

এটাই হলো হুজুরদের বক্তব্য। একারণেই তারা দুনিয়ার সব ন্যায় অন্যায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের কোনায় বসে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এই পন্থায় হুজুররা যতটা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন কাটাচ্ছেন আল্লাহর রসুল বা তার সাহাবীরা কিন্তু সারা জীবনে সে শান্তির মুখ দেখেন নি। মাক্কী জীবনে কাফির মুশরিকদের হাতে অত্যাচার নির্যাতন আর মাদানী জীবনে একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে তাদের ব্যস্ত সময় কেটেছে। প্রতিটা মুহুর্তে কখন কোথায় কেউ হামলা করে

সেই ভয়ে তটস্থ থেকেছেন। একটি আয়াতে সেই অবস্থার চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ﷻ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন,

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس

স্মরণ করো যখন তোমরা পৃথিবীতে সংখ্যায় অল্প আর শক্তিতে দূর্বল ছিলে। সর্বদা এই ভয়ে তটস্ত থাকতে যে কখন হয়তো কাফিররা তোমাদের ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। [আনফাল/২৬]

তাফসীরকারকরা বলেছেন, বিশেষত মাক্কী জীবনে মুসলিমদের এই হাল ছিল। কিন্তু হুজুররা সারাটা জীবনে কখনও এমন হালে কাটিয়েছেন কি? আয়াতে বর্ণিত অবস্থাটা কেবল জঙ্গীদের সাথেই মেলে। তাগুতের লোক কখন যে তাদের ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। হুজুরদের এ নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। কারণ তাগুতের সাথে তাদের আগেই রফা হয়ে গেছে। আল্লাহর রসুল শান্তি প্রতিষ্ঠার

কথা বলেছেন তাই তারা কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি করে নিয়েছেন। ফলে দুনিয়াবী জীবনে তারা চরম শান্তি লাভ করেছেন। প্রশ্ন হলো, এটাই যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অর্থ হয়ে থাকে এবং রসুলুল্লাহ ﷺ সে মিশন নিয়েই দুনিয়াতে এসে থাকেন তবে তিনি এবং তার সাহাবারা এমন শান্তি কেনো পেলেন না। তারা তো সারাটা জীবন দুঃখ কষ্ট আর যুদ্ধ বিগ্রহ করে গেলেন। শান্তিই যদি ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হবে তবে এতো অশান্তির কোনো দরকার ছিল কি?

আসলে এখানে একটা সূক্ষ্ম ভুল হচ্ছে। শান্তির কথা বলা হচ্ছে কিন্তু শান্তিটা কার সেটা সবাই ভুলে যাচ্ছে। বিষয়টা অনেকটা ঐ ব্যক্তির মতো যে নিজের হোটেলে মাথা পিছু দুই তিন হাজার টাকা মাসিক পারিশ্রমিকে কয়েকজন কর্মচারী রাখলো। বেশ কিছু মিষ্টি তাদের সামনে দিয়ে বলল, এগুলো শেষ করে বাড়ি থেকে আরও মিষ্টি নিয়ে আসবে। লোকটি চলে যাওয়ার পর কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি বলল, উনি মিষ্টিগুলো শেষ করে আরও মিষ্টি আনতে বলেছেন। এসো আমরা সবাই

মিলে মিষ্টি গুলো শেষ করে দিই। সবাই তার কথা মতো তড়িঘড়ি করে মিষ্টিগুলো উদরস্ত করলো। তারপর একজন গিয়ে হোটেল মালিকের বাড়ি থেকে আরও মিষ্টি নিয়ে আসলো। এভাবে কয়েকবার মিষ্টি এনে নিজেরাই সাবাড় করলো। হোটেলে এতো এতো মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে দেখে হোটেল মালিক তো ভীষণ খুশি। দুপুরের পর দোকানে এসে বলল, এতো মিষ্টি বিক্রি করলে এবার টাকাগুলো দাও। কথা শুনে কর্মচারীরা সবাই তো অবাক। তারা তো আর মিষ্টি বিক্রি করেনি নিজেরাই স্বক্রীয়ভাবে সেগুলো সাবাড় করেছে। সব শুনে হোটেল মালিক কতটা রাগান্বিত হলো সেটা আশা করি পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হবে না। সেই সাথে ঐ সকল কর্মচারীরা কতটা নির্বোধ ছিল সেটাও সবাই অনুধাবন করতে পারছেন আশা করি।

আমাদের ওলামা হজরতরাও তাদের মতোই বোকামী করেছেন। আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সকল মানুষকে শান্তিতে রাখতে হবে। আর ওনারা বুঝেছেন দুনিয়ায় যার যা হচ্ছে হোক সেসব বাদ

দিয়ে নিজেরা ঘরের কোণায় শান্তিতে বসে থাকতে হবে। এই শান্তিতে রাখা আর শান্তিতে থাকার মধ্যে যে কতটা পার্থক্য তা সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে।

বিশ্বের বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে শান্তিতে রাখার অর্থ হচ্ছে নিরীহ মানুষের উপর জুলম-নির্যাতন হতে দেখে জালিমের বিপরীতে রুখে দাড়িয়ে তার প্রতিবাদ করা। বিশ্বের সকল কাফির মুশরিক ও তাদের দোসর তাগুতী শক্তি আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধানে বিচার ফয়সালা করছে এবং এভাবে তারা নিজেরাই মানুষের উপর রব হয়ে বসেছে। মানুষকে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে আসার নামই হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। মুগীরা ইবনে শো'বা কত সুন্দর করে কথাটা বলেছেন।

যেসব গো-মুর্খ ওলামা হজরত দাবী করেন, কেউ আগে আক্রমণ না করলে ইসলাম কখনও আক্রমণ করে না তাদের জন্য কাদিসিয়ার যুদ্ধে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ইবনে কাছির বর্ণনা করেন,

وقد رأى رستم في منامه كأن ملكا نزل من السماء، فختم على سلاح الفرس كله، ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر

পারস্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রুস্তম স্বপ্নে দেখে একজন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এসে পারস্যদের সকল অস্ত্র জমা করে রসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে প্রদান করেন আর রসুলুল্লাহ ﷺ সেগুলো উমর ﷺ এর হাতে প্রদান করেন। [বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

এর মাধ্যমে সে বুঝতে পারে এ যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত। তাই সে কোনো ভাবেই মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলো না। সে নানা ভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে মুসলিমদের দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করছিলো। এ বিষয়ে সে কয়েক দফায় মুসলিমদের সাথে বৈঠক করে। এমনি একটি বৈঠকের উদ্দেশ্যে মুগীরা ইবনে শো'বা রুস্তমের নিকট আগমন করেন। রুস্তম তাকে বলে,

إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم

ولا نمنع تجاركم من الدخول إلى بلادنا

তোমরা আমাদের প্রতিবেশী। আমরা তো তোমাদের কোনো সমস্যা করি না। অতএব, তোমরা দেশে ফিরে যাও আমরা তোমাদের ব্যবসায়ীদের আমাদের এলাকায় প্রবেশ করতে বাধা দেবো না। [বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

এমনকি সে বলেছিল,

قد أمرت لكم بكسوة، ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا

যদি তোমরা ফিরে যাও তবে আমি তোমাদের পোশাক-আশাক দেবো এবং তোমাদের আমীরকে এক হাজার দিনার দেবো আর পোশাক ও বাহন দেবো।

এসব শুনে মুগীরা ইবনে শো'বা সেদিন যা বলেছিলেন আমাদের হুজুরগণকে তা কায়দা পড়ার মতো মুখস্ত করানো উচিৎ। তিনি বলেছিলেন,

إنا ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة

আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য দুনিয়া নয় বরং আমাদের লক্ষ্য

উদ্দেশ্য হলো আখিরাত।

এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ আমাদের নিকট তার রসুল পাঠিয়েছেন। এরপর রসুলুল্লাহ ﷺ কি জন্য এসেছে সেটা বর্ণনা করেন। তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন,

وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله

মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে ঢুকানোর জন্য।

আরও একজন সাহাবী রুস্তমের সাথে বৈঠক করেছিলেন। তিনিও হুবহু একই কথা বলেছিলেন। তিনি এও বলেন যে,

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

আর মানুষকে অন্য ধর্মের জুলুম থেকে রক্ষা করে ইসলামের ন্যায় ইনসাফের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য।

এরপর তারা রুস্তমের নিকট হয়তো মুসলিম হওয়া অথবা জিজিয়া প্রদান করা অথবা যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বৈঠক শেষ করেন। পাঠক ভাল করে চিন্তা করে

দেখুন তো এসব কথা ঘর কুনো হুজুরদের শান্তিকামী বক্তব্যের সাথে মেলে নাকি জঙ্গীদের বিশ্ব জয়ের স্বপ্নের সাথে বেশি মেলে। তবে কি হুজুররা সাহাবায়ে কিরামকেও জঙ্গী বলবেন?

রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন,

وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر

আমিই বিনাশকারী আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরীকে বিনাশ করবেন। [বুখারী]

দেখা যাচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠা বলতে আল্লাহর রসুল নিজে এবং তার সাহাবায়ে কিরাম বুঝতেন যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে ঐ সকল তাগুতী শক্তির সাথে লড়াই করে পৃথিবীর মানুষকে স্বাধীন করে দেওয়া। আর হুজুররা বুঝছেন তাগুতী শক্তিকে সমাজের বুকে যা খুশি করার সুযোগ দিয়ে নিজেরা ঘরের কোণায় বসে শান্তিতে ইবাদত বন্দেগী করা। মতামতের এই পার্থক্যের কারণেই সাহাবায়ে কিরামের সাথে বর্তমান যুগের ওলামাদের কাজের এতো অমিল।

তাদের অবস্থা ঐ হোটেলের কর্মচারীদের মতোই। যাদের নিয়োগ করা হলো মানুষের কাছে মিষ্টি বিক্রি করে টাকা কামাই করার জন্য কিন্তু তার বদলে তারা মিষ্টি খেয়ে দোকান ফাঁকা করে দিলো। তারা এতটুকুও চিন্তা করলো না যে, নিজের দোকানের মিষ্টি খাওয়ার জন্য কেউ কাউকে দু'চার হাজার টাকা বেতন দিয়ে নিয়োগ করে না। নির্বোধ হুজুররাও এটা বুঝতে পারলো না যে, কেবল মিষ্টি খাওয়ার সুন্নাত আদায় করে জান্নাতের মতো মহা পুরষ্কার পাওয়া সম্ভব নয়। বরং জান্নাত পেতে হলে অনেক কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হবে। মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

তোমরা কি মনে করেছো জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও আল্লাহ প্রকাশ করেন নি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে (আল্লাহর রাস্তায়) সবর করেছে।

[আলে ইমরান/১৪২]

সংস্কার নাকি কুসংস্কার

উপরের আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবায়ে কিরাম সমাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য নয় বরং সমাজ সংস্কার করার জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন। সারাটা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। সমাজে যারা দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন সেই সব জালিম ও কাফিরদের সাথে তারা লড়াই করেছেন। এই ছিল তাদের সারাটা জীবনের কর্মপন্থা। বিপরীত দিকে ঘরকুনো হুজুররা সমাজের সমস্যা সমূহ সংস্কার নয় বরং সমাজপতিদের সামনে মাথা নত করে নিজের আয় রোজগারের পথ পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত। লেজ কাটা শেয়াল যেমন চায় অন্য সকল শেয়াল লেজ কেটে ফেলুক এই সব কাপুরুষ ওলামা হজরতরাও চায় পুরো মুসলিম উম্মাহ্ তাদের মতো ঘরকুনো হয়ে যাক। যারা সমাজকে সংশোধন করার জন্য ভূমিকা রাখতে চায় আর তাই তাগুতী সরকার তাদের জেল জুলুমের শিকারে পরিণত করে বা ফাঁসিতে ঝুলায় ঘরকুনো হুজুররা গর্ব করে তাই

বলে যা সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা বলেছিল।

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا

যদি তারা আমাদের সাথে থাকতো তবে মরতো না আর নিহতও হতো না।

[আলে ইমরান/১৫৬]

এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে নিরাপত্তা অর্জনকেই বুদ্ধিমত্তা আর দুনিয়াতে জেল জুলুমের শিকার হওয়াকে বোকামী মনে করে। অথচ তারাই প্রকৃত বোকা কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।

কিন্তু কথায় বলে, কাকের মুখে ককিল ডাক। ঘরকুনো স্বভাবের এসব হুজুররা বিশ্বের সকল মানুষকে তাগুতের জুলুম নির্যাতনের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জীবনকে নিরাপদ করার চেষ্টায় সদা সর্বদা ব্যস্ত। অথচ যখনই বলা হয়,

- বিশ্বের বুকে এই যে এতসব অনিয়ম আর চরম

জুলুম নির্যাতন চলছে। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন চলছে না। কাফির মুশরিকদের হাতে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের কোনো চেষ্টাই তো আপনারা করছেন না। এসবের সংস্কার জরুরী নয় কি? এটাই কি রসুলুল্লাহ ﷺ এর মিশন নয়? কিন্তু আপনারা তো এ থেকে অনেক দূরে। এরপরও কিভাবে দাবী করেন, আমরা রসুলের অনুসারী!

প্রশ্ন শুনেই কাপুরুষ হুজুররা বুঝতে পারে তাদের গোমড় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে তারা এখানে আরো একটা গেঁরো দেওয়ার চেষ্টা করেন। মুখে কৃত্রিম চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলেন,

- মুসলিমদের এহেনো দুর্দশা আর পৃথিবীর বুকে এসব জুলুম নির্যাতন দেখে আমরা যার-পর-নাই চিন্তিত। আমরাও এসবের সংস্কার ও সংশোধন চাই। তবে তা মারামারি ও হৈ হট্টগোলের মাধ্যমে নয়। বরং শান্তিপূর্ণ দা'ওয়াতের মাধ্যমে। কাউকে আঘাত করে নয় বরং

> সবাইকে ভালবেসে বুকে টেনে নিয়ে আর বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনতে হবে। এভাবে দা'ওয়াত দিতে থাকলে একদিন পৃথিবীর সকল মানুষ ঠিক হয়ে যাবে। জুলুম, নির্যাতন, অন্যায় উৎপীড়ন তখন খুঁজেই পাওয়া যাবে না। এর জন্য মারামারি কাটাকাটি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কথাটা শুনে যে কারো হয়তো পছন্দ হয়ে যাবে। আসলে সুখ শান্তির কথা শুনলেই মানুষ চট করে পছন্দ করে ফেলে। আর তাই তো সমাজ সংস্কারের এই নিরঝঞ্ঝাট পন্থাটা তাদের বেশ মনে ধরে। তাগুতী শক্তির সামনে বুক টান করে দাঁড়ানোর শক্তি যাদের নেই এধরনের আজগুবী চিন্তা ফিকির তাদের মাথায়ই আসে। উপরে আমরা মৃত হাসের পেট থেকে ডিম বের করার ঘটনা উল্লেখ করেছি। আমরা বলেছি সেটা একটা উদ্ভট কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এই মতবাদটি তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্ভট। কারণ মৃত হাসের পেটে দু'একটা ডিম অনেক সময় থাকে কিন্তু চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী ও স্বার্থান্বেষী

সকল প্রকার মানুষকে কেবল ভালবেসে আর বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনার ঘটনা পৃথিবীতে একটি বারের জন্যও ঘটেনি। কিছু দুষ্টু লোক হয়তো মিষ্টি কথার মাধ্যমে পথে আসে কিন্তু বেশিরভাগ লোক গলার উপর আঘাত না পড়া পর্যন্ত যা করছিল তাই করতে থাকে। অতএব তাতে তো আর সমাজ সংস্কার হতে পারে না।

স্বয়ং নবী রাসুলরাও কি সকল মানুষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনতে পেরেছেন? আদম ﷺ থেকে থেকে শুরু করে ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত বহু সংখ্যক নবী রাসুল এসেছেন। তাদের অনেকের কাহিনীই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। দ্বীনের দা'ওয়াত দেওয়ার কারণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের কি ধরনের সংঘর্ষ হয়েছিল আর তার পরিণতিতে কিভাবে তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়ে নবী ও তার উম্মতকে বাঁচানো হয়েছিল এসব কাহিনীতো দশ বারো বছরের বালকও জানে। কিন্তু কোনো নবী কেবল মাত্র বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্পূর্ণ একটা জাতিকে পথে এনেছেন এমন ঘটনা বিরল। আর পুরা

বিশ্বকে পথে আনার কাহিনী তো সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা যার কোনো নজীরই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব বিষয়টাকে সংস্কার না বলে কুসংস্কার বলাই শ্রেয়।

বাস্তব কথা হলো, বুঝিয়ে শুনিয়ে কিছু লোককে নিশ্চয় পথে আনা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ লোক বুঝতে চায় না। তাদের যতই বোঝানো হোক তা গাধার কানে মন্ত্র পড়ার মতো হয়। তারা বোঝে তরবারির ভাষা। যে দল বিজয়ী হয় তারা তাদের অনুসরণ করে। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا

যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে আর আপনি দেখবেন মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। [নাসর/১,২]

একারণে মহান রব্বুল আলামীন দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অসি এবং মসি উভয় ব্যবস্থায় বলবৎ রেখেছেন।

ইবনুল কায়্যিম ﵀ যাদুল মা'আদে বর্ণনা করেন, মক্কা

বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণের আহ্বান নিয়ে আমর ইবনুল আস ﵁ কোন এক বাদশার নিকট গমণ করলে তিনি প্রশ্ন করেন,

- কুরাইশরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছে?

আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন,

تبعوه اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف

তারা সবাই তাকে মেনে নিয়েছে। কেউ তো স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে আর কেউ তরবারির চাপে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম প্রচারে দা'ওয়াত ও তরবারি উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। যারা এর মধ্যে যে কোনো একটাকে স্বীকার করে আর অন্যটা অস্বীকার করে সে ইসলামেরই একটা অংশকে অস্বীকার করলো। যেহেতু উভয় বিধানই ইসলামে রয়েছে আর স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবায়ে কিরাম উভয় বিধানের উপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী থেকেই আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা পায়। আমরা দেখি, দা'ওয়াত দিয়ে তিনি সংস্কারের কাজ শুরু করেন কিন্তু এক পার্যায়ে এসে কাফিরদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। এর কারণ একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষে বাতিলের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয় তাই সংঘর্ষের আগে তাকে শক্তি ও জনবল সংগ্রহ করতেই হবে। আর এর একমাত্র মাধ্যম হলো দা'ওয়াত। এভাবে দা'ওয়াতের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক জড়ো হয়ে গেলে বাতিলের সাথে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। এটাই ইসলামের দাবী। কিন্তু সারাটা জীবন কেবল দা'ওয়াতই দিয়ে যাবো, আসল জিহাদ কখনই করবো না এটা সত্যিকার ঈমানদারীর পরিচয় নয় বরং মুনাফিকের পরিচয়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق

যে কেউ এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে যুদ্ধে গমন করেনি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছাও অন্তরে নেই তবে সে নিফাকীর একটা অংশের উপর মৃত্যুবরণ করলো।

[মুসলিম]

তাছাড়া এখানে একটা প্রশ্ন করা যায়। চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, স্বার্থান্বেষী এবং সেই সাথে নাস্তিক মুরতাদ আর বেধর্মী কাউকে আঘাত না করে কেবল ভালবেসে পথে আনতে হবে এই মতবাদ যারা সগর্বে প্রচার করে বেড়ান তারাই আবার জঙ্গীদের বিচার কেনো চান? তাগুতী সরকারের নিকট জঙ্গী নিধনের আহ্বান কেনো জানান? তাদেরও তো ভালবেসে কাছে ডেকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনা উচিৎ, তাই না?

জঙ্গীরা নাস্তিক মুরতাদ বা জালিম সরকারের উপর আঘাত হানলে বুযুর্গী ফলিয়ে বলেন, তারা যতই খারাপ হোক তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনতে হবে। তাদের কাছে দা'ওয়াত দিতে হবে। কিন্তু সরকার যখন জঙ্গীদের উপর হামলা করে বা জেল ফাঁস দেয় তখন বলে,

- ঠিকই হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল।

হিসেব অনুযায়ী এখানে তাদের বলা উচিৎ ছিল,

- আহা! এসব অবুঝ পোলাপানদের এভাবে মেরো

না। বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনার চেষ্টা করো।

কিন্তু এই একটা ব্যাপারে সবাই উল্টা পাল্টা আচরণ করে। চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী আর নাস্তিক মুরতাদদের উপরও মানুষের মায়া হয় কিন্তু জঙ্গীদের ব্যাপারে কারো কোনো মায়া দরদ হয় না। কোনো কুখ্যাত সন্ত্রাসী বিচার বহির্ভূতভাবে ক্রসফায়ারে নিহত হলে সাংবাদিকরা সেই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে লেখালেখি করে কারণ সন্ত্রাসীরও সঠিক বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু জঙ্গীদের ক্ষেত্রে কেউ কিছুই বলে না। কারণ তাদের কোনো অধিকার নেই। ভাড়াটে মোল্লারা জঙ্গীদের জানাজা পড়াতে অস্বীকার করেন। উনি বিশাল বুযুর্গ তাই খুনিদের জানাজা পড়াবেন না। অথচ নাস্তিক, মুরতাদ, ফাসিক ফুজ্জার আর চোর ডাকু সন্ত্রাস কারো জানাজা পড়াতে বাদ রাখেন না। কেবল জঙ্গীদের বেলায় ওনার ঈমান চাঙা হয়ে ওঠে। কোনো কোনো বুযুর্গ কাফির মুশরিকদের পর্যন্ত অভিশাপ দেয় না। বড় জোর বলে,

- হে আল্লাহ তাদের হেদায়েত দাও।

কিন্তু জঙ্গীদের ব্যাপারে তারা অভিশাপ দেয় আর বদ

দোয়া করে। বলে,

- হে আল্লাহ ওদের কপালে যদি হেদায়েত না থাকে তবে ধ্বংস করে দাও।

শকুনের দোয়ায় যদিও গরু মরে না কিন্তু তারপরও বলবো এতে হুজুরদের শকুন স্বভাব তো নিশ্চয় প্রকাশিত হয়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, গিরগিটি ইব্রাহীম ﷺ এর আগুনে ফুঁ দিয়েছিলো। তাই তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। গিরগিটির ফুঁ-তে নমরুদের আগুন নিশ্চয় বাড়া কমা হয় নি কিন্তু এর মাধ্যমে তার অসৎ স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে তাই তার শাস্তি আবশ্যক হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে হুজুরদের এই সৎ মা সুলভ আচরণের ক্ষয়ক্ষতিও একান্তই তাদের উপর বর্তায়। আশা করা যায় যে, এ কারণে বীর মুজাহিদদের তেমন কোনো ক্ষয় ক্ষতি হবে না। ইনশাআল্লাহ।

মোট কথা, বাতিলের সাথে কোনোরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ দা'ওয়াতের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের চিন্তা একদিকে যেমন আজগুবী ও পাগলের

প্রলাপ হিসেবে গণ্য। বিপরীতে এটা হুজুরদের নতুন একটা চাল। কেবল আল্লাহর শত্রুদের সাথে তারা নরম আচরণের কথা বলে কিন্তু যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করতে চায় তাদের ব্যাপারে তারা অত্যাধিক কঠোর। তাদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রসুল এবং তার সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

أشداء على الكفار رحماء بينهم

তারা কাফিরদের উপর কঠোর আর মুমিনদের উপর দয়ালু।

[ফাতহ/২৯]

এরা হলো, ঠিক এর উল্টো। কাফিরদের উপর দয়ালু আর মুমিনদের উপর কঠোর। একারণেই কাফিরদের উপর মু'মিনরা আঘাত করলে তারা নানা রকম ফতোয়াবাজী করে সে আঘাত বন্ধের চেষ্টা করে। কিন্তু মুজাহিদদের উপর কাফিরদের আঘাত করতে দেখলে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বরং ফতোয়াবাজী করে

কাফিরদের জঙ্গী নিধনে উৎসাহিত করে। তখন একবারও ভালবেসে বোঝাতে বলে না। জঙ্গীদের নিকট হকের দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে বলে না। ভালবেসে বোঝাতে বলে কেবল আল্লাহর শত্রুদের। এই দ্বিমুখী নীতি হুজুরদের কুৎসিৎ রুপটা আরও একবার প্রকাশিত করে।

দ্বীনের দা'ওয়াত নাকি দানের দা'ওয়াত

উপরে আমরা বলেছি, কেবলমাত্র দা'ওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বরং দা'ওয়াত ও জিহাদ উভয়ের দরকার আছে। হুজুররা এখানে একটা গেঁরো লাগানোর চেষ্টা করতে পারে। তারা বলবে,

- এটা তো আমরা জানি। তাই তো এখন দা'ওয়াত দিচ্ছি পরে ঠিকই জিহাদ করবো। সে প্লান আমাদের আছে।

আসলে শয়তান লোকের শয়তানীর শেষ নেই। হয় কাজ নয় করার লোকের যেমন অভাব নেই তেমনি যা নয়

তাকে ছয় বানিয়ে ফেলার লোকও আছে। বাংলায় বলা হয়, তিলকে তাল করা। সেটাও না হয় মানলাম কিন্তু একেবারে জিরো থেকে হিরো বনে যাওয়ার চেষ্টাটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অস্ত্র হাতে জিহাদ করার কোনো ইচ্ছা মোল্লাদের অন্তরে আছে কি নেই সেটা তাদের বাইরের কার্যক্রম দেখে বেশ টের পাওয়া যায়। তবু নিজেকে ভাল প্রমাণ করার জন্য অনেকে মুখে অনেক রকম আজগুবী দাবী করে। রসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মুনাফিকরা কখনই জিহাদের অংশগ্রহণ করতো না। কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলতো, আমি তো জিহাদের যেতেই চেয়েছিলাম কিন্তু এই এই সমস্যার কারণে যেতে পারি নি। আল্লাহ ﷻ তাদের এ দাবী খন্ডায়ন করে বলেন,

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

যদি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা তাদের থাকতোই তবে তো তারা তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। [তাওবা/৪৬]

অর্থাৎ যুদ্ধে যাওয়ার পরিপূর্ণ ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ একটা

সমস্যার কারণে যেতে পারিনি এমন হলে তো তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতো কিন্তু যুদ্ধের জন্য তারা যে মোটেও প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি এ থেকে বোঝা যায় আগে থেকেই তাদের যুদ্ধে না যাওয়ারই নিয়ত ছিল। সুতরাং তাদের কার্যক্রমে মুখের দাবীর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হুজুররা বলেন, আমরা এখন দা'ওয়াত দিচ্ছি সময় হলে ঠিকই জিহাদ করবো। কিন্তু তাদের কার্যক্রমে এ কথার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় কি? যে ব্যক্তি সত্যি সত্যিই বাতিল শক্তির সাথে একদিন না একদিন সংঘর্ষে জড়াতে চায় তার দা'ওয়াত ও অন্যান্য কার্যক্রম যেমন হওয়া উচিৎ হুজুরদের কার্যক্রম তেমন মনে হয় কি? কয়েকটা বিষয়ের উপর আলোচনার মাধ্যমে আমরা তা মিলিয়ে দেখতে পারি।

ক) পাঠক একটু চিন্তা করুন। যে দ্বীন অন্য সকল বাতিল দ্বীনকে ধ্বংস করতে চায় এবং সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হতে চায়। যে দ্বীন বিশ্বের সকল অশুভ শক্তির সাথে লড়াই করে সকল অন্যায় অবিচার বন্ধ করে দিতে

চায় সেই দ্বীনের দাওয়াত কেমন হবে। দুর্বার ও আপোসহীন হবে নাকি দূর্বল ও শক্তিহীন হবে? স্বাভাবিক বুদ্ধির যে কোনো মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য যে, এ ধরণের দা'ওয়াত দূর্বল ও আপোসকামী হতে পারে না। যে দা'ওয়াত শুরুতেই বাতিলের সাথে আপোস করে তার পক্ষে কষ্মিনকালেও বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। বরং এমন একটা দা'ওয়াত অবশ্যই দুর্বার ও আপোসহীন হবে। যে সমাজকে সে সংস্কার করতে চায় তার ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো প্রকাশ্যে তুলে ধরে নিন্দা জানানোর ক্ষমতা তার থাকতে হবে।

আল্লাহর রসুল এবং তার সাহাবীদের দা'ওয়াত কিন্তু হুবহু এরকমই ছিল। দা'ওয়াতের শুরুতেই রসুলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের মুখের সামনে তাদেরই ধর্ম, দেব-দেবী এবং অন্য সকল ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো নির্ভিকভাবে তুলে ধরেছেন। কাফিররা তাকে সম্পদ, নারী ও নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে এ দা'ওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেয়েছে কিন্তু তিনি সামন্যও পিছপা হোন নি। শেষে তারা এও বলেছে যে, তুমি আমাদের দেবতাদের কিছুদিন ইবাদত

করলে আমরাও তোমার রবকে কিছুদিন ইবাদত করবো। কিন্তু মহান নবী এই বোকামী সুলভ সমবন্টনকে মেনে নেন নি। উল্টো দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন,

والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه، ما تركته. قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى

আল্লাহর কসম তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় আর এ দ্বীনের দা'ওয়াত পরিত্যাগ করতে বলে তবে আমি কখনও তা পরিত্যাগ করবো না। এতে হয় আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয়ী করবেন অথবা আমি তার দ্বীনের জন্য জীবন দিয়ে দেবো। এরপর তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে আসে আর তিনি কেঁদে ফেলেন।

[ইবনে হিশাম]

রসুলুল্লাহ ﷺ এর এই দৃঢ় অবস্থানের সাথে বর্তমান যুগের ওলামা হজরতদের অবস্থানের যদি তুলনা করা হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

এযুগের তথাকথিত বুযুর্গানে দ্বীন চন্দ্র-সূর্য নয়, এক হাতে কয়লা আর অন্য হাতে ময়লা পেলেই তাগুতের যে কোনো প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবেন এবং যতসামান্য পারিশ্রমিক পেয়েই খুশিতে হেসে ফেলবেন। বর্তমান যুগের তাগুতী শক্তির আলেম ওলামাদের নিকট আসতে হয় না বরং আলেম ওলামারাই দান সাদকা তোলার জন্য তাগুতের কাছে ধরনা দেয়। সমাজপতিদের মাল-পানি খেয়েই হুজুররা বেঁচে থাকে। তাই সমাজপতিদের সামনে হক কথা বলা দূরে থাক উল্টো তাদের বাতিলের পক্ষে সাফাই গেয়ে চলেন তারা। সব সময় এই ভয়ে থাকেন যে, কখন তারা হয়তো অসন্তুষ্ট হয়ে দান করা বন্ধ করে দেয়। অতএব, তাদের যে দা'ওয়াত দেন তাকে দ্বীনের দা'ওয়াত না বলে, দানের দা'ওয়াত বলাই অধিক সঙ্গত। তাদের এই দা'ওয়াতের মাধ্যমে কিয়ামত অবধি না বাতিলকে পরাজিত করা সম্ভব হবে আর না তাদের সাথে বাতিলের কখনও সংঘর্ষ বাঁধবে। অতএব, এখন দা'ওয়াত দিচ্ছি পরে ঠিকই বাতিলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো তাদের এমন দাবী সম্পূর্ণ অমূলক। বৃষ্টি হওয়ার আগে যেমন মেঘের গুড় গুড় শব্দ শোনা যায় হকের

দা'ওয়াত শুরু হলে তেমন অবস্থাই সৃষ্টি হবে। সংঘর্ষের আগেই সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে। মাক্কী যুগে কি আল্লাহর রসুল এবং তার সাহাবায়ে কিরাম হুজুরদের মতো নিরাপদে শান্তিতে থাকতে পেরেছিলেন? তারা সংঘর্ষ বাঁধার মতো পরিবেশের মধ্যে সময় অতিবাহিত করেছেন। হকের দা'ওয়াত সঠিক পন্থায় দিলে অবস্থা তেমনই হবে। কোনো ব্যতিক্রম হবে না। হকপন্থীরা আপোসহীন হলে বাতিলের সাথে তাদের সম্পর্ক মেঘ গুড় গুড় করার মতই উত্তপ্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। দা'ওয়াত হতেও হবে ঐরকমই আপোসহীন।

তাছাড়া সে দা'ওয়াতে যারা সাড়া দেবে দা'ওয়াতটা কিসের দাওয়াত সেটা আগে থাকেই জানা থাকতে হবে। কেউ পিকনিক করার জন্য এক পাল লোক ডেকে এনে তাগুতের সাথে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিলেই তো আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতে তারা যে বাতিলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে সেটা আগে থেকেই জানতে হবে যাতে তারা আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

তা না হলে অবস্থা হবে ঐ গ্রামের মতো যেখানে প্রায়ই ডাকাত পড়তো। গ্রামের লোকগুলো ছিল ভীতু আর কাপুরুষ। যার বাড়ি ডাকাত পড়তো সে বাঁচাও বাঁচাও বলে শত চিৎকার চেচামেচি করলেও কেউ ছুটে আসতো না। শেষে গ্রামের মড়ল মাতব্বররা একটা ফন্দি আঁটলো। পরের বার একজনের বাড়ি ডাকাত পড়ার সাথে সাথে ঘোষণা করে দেওয়া হলো,

- অমুকের বাড়ি যাত্রাপালা হচ্ছে সবাই লাঠি নিয়ে চলে এসো।

যাত্রা পালা হচ্ছে শুনে সবাই খুব খুশি হলো। কিন্তু যাত্রা পালায় লাঠি নিয়ে যেতে হবে কেনো সেটা কিছুইতে বুঝতে পারলো না। তারা ভাবলো হয়তো পাটি বলতে গিয়ে লাঠি বলে ফেলেছে তাই সবাই পাটি নিয়ে ঐ ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। গিয়ে যখন চিৎকার চেচামেচি শুনলো তারা ভাবলো এসব বুঝি যাত্রারই অংশ। সবাই উঠানে পাটি পেড়ে বসে বসে ডাকাত দলের কার্যকলাপকে যাত্রা মনে করে উপভোগ করতে লাগলো।

এক কাজের নামে আরেক কাজে ডেকে নিয়ে আসলে

অবস্থা এমনই হয়। হুজুররা সাগরেদদের শেখাচ্ছেন তাগুতের আনুগত্য করে কিভাবে দুনিয়া গড়া যায় সেই শিক্ষা। আর আশা করছেন এক সময় এরা তাগুতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এটা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কি? বরং সংঘর্ষ বেঁধে গেলে এটা যে পাটি পেড়ে বসে যাত্রা পালা দেখার মতো তা উপভোগ করবে তাতে কোনো সন্দেহ করা চলে না। বর্তমানে আমরা এর প্রমাণও পাচ্ছি। বরেণ্য কোনো আলেমকে গ্রেফতার করে তাগুতের লোকে জঘন্য উপায়ে শাস্তি দিচ্ছে আর তার হাজার হাজার ভক্ত সাগরেদ হা করে তামাশা দেখছে। এর অর্থ কি এই নয় যে, হুজুররা যেমন কর্ম করেছে তেমন ফল পাচ্ছে? তারা যেমন দা'ওয়াত দিয়েছে তেমন কর্মী জোগাড় হয়েছে আর ফলাফলটা তেমনই হচ্ছে।

যে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে আসলেই বাতিলের মোকাবিলা করা সে দা'ওয়াতটা তাই আসলেই স্পষ্ট হতে হবে। সেটা দ্বীনের দা'ওয়াত হতে হবে দানের দা'ওয়াত নয়।

কিন্তু হুজুরদের দা'ওয়াত দানের দা'ওয়াত দ্বীনের দা'ওয়াত নয়। দ্বীনের বিধান মতে যার মধ্যে যে ত্রুটি

তারা সেটা নিয়ে আলোচনা করেন না বরং যার কাছে যেমন কথা বললে দান বেশি পাওয়া যাবে তার কাছে তারা তেমন কথাই বলার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই দা'ওয়াতের মাধ্যমে সত্যি সত্যিই তারা একদিন বাতিলকে পরাজিত করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন এমন দাবী বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়।

ফিতনা ফাসাদ কি?

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

তোমরা পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পর আবার ফাসাদ সৃষ্টি করো না। [আ'রাফ/৫৬]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

والفتنة أشد من القتل

ফিতনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য। [বাকারা/১৯১]

এছাড়া আরও অনেক আয়াত ও হাদীসে ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুসলিমদের নিষেধ করা হয়েছে। অমনি হুজুররা

সুযোগ পেয়ে গেছে। তারা এখানে আরও একটি গেঁরো দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সম্ভবত এটাই তাদের শেষ গেঁরো। তবে তাদের শেষ গেঁরোটিও বিশেষ শক্ত নয়। নিচের আলোচনায় সেটাই প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

তারা বলে,

- জুলুমের প্রতিরোধ করতে হবে বাতিলকে ধ্বংস করতে হবে সব ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে তো আর ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা যাবে না। এটা ইসলামে নিষেধ।

তাদের মতে বাতিলের সাথে যুদ্ধ করা আর নাস্তিক মুরতাদ ও তাদের দোসরদের উপর হামলা করা অর্থ ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা। এক সময়কার মানুষের বর্ণনা দিয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يرون الجهاد ضررا، والزكاة مغرما

তারা তখন জিহাদকে ক্ষতিকর আর যাকাতকে জরিমানা মনে করবে।

এখনতো দেখি সেই যুগই এসে গেছে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে খোদ হুজুররাই ফিতনা ফাসাদ হিসেবে আখ্যায়িত করছে অথচ কুরআনের কথা অনুযায়ী জিহাদ ফিতনা নয় বরং জিহাদের মাধ্যমে ফিতনা দূর করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [আনফাল/৩৯]

আয়াত হতে স্পষ্ট বোঝা যায় বাতিলের সাথে যুদ্ধ করার মাধ্যমে ফিতনা শেষ হয়। অথচ হুজুররা বুঝছেন যুদ্ধ করলে ফিতনা সৃষ্টি হয়। কুরআনের সাথে তাদের কথা মিলছে কি?

এতক্ষণে পাঠকের অন্তরে একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার কথা।

- তাহলে ফিতনাটা আসলে কি জিনিস?

উপরের আয়াতের উপর সামান্য চিন্তা করলে আপনি নিজেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ফিতনা শেষ করে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে হবে। এর অর্থ কি এই নয় যে, আল্লাহর দ্বীন কায়েম না থাকাটাই ফিতনা? শিরক, কুফর, মানবরচিত সংবিধান ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী ইসলামের দৃষ্টিতে তাই আসলে ফিতনা।

উপরের আয়াতটির কথাই একবার চিন্তা করুন। আল্লাহ বলেন, ফিতনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য। এখন হুজুররা তো জঙ্গীদের নিন্দা করে কারণ তারা মানুষ হত্যা করে। কিন্তু আল্লাহ তো বলছেন এই মানুষ হত্যার চেয়েও জঘন্য হলো ফিতনা। তাহলে সেই ফিতনাটা কি? তাফসীর কারকরা এখানে ফিতনা শব্দের অর্থ করেছেন শিরিক কুফর ইত্যাদি বাতিল মতবাদ। ইবনে জারীর তাবারী ফিতনার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন যা মূলত দুটি উৎস হতে উৎসরিত। ক) মানুষকে মারধর করে বা অন্য কোনো কষ্ট দিয়ে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। খ) শিরক কুফর ইত্যাদি বাতিল কাজে লিপ্ত

হওয়া।

ইমাম কুরতুবী ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন,

شركهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل الذي عيروكم به

অর্থাৎ হে মুসলিমরা তোমরা যে খুন করেছো বলে তারা তোমাদের নিন্দা করছে তার চেয়ে তারা যে শিরিক কুফরে লিপ্ত আছে সেটা অধিক পাপের কাজ এবং অধিক জঘন্য। [তাফসীরে কুরতুবী]

যে সব ওলামা মাশায়েখ কাফির মুশরিক আর তাদের দোসর তাগুতী সরকারের সাথে একজোট হয়ে জঙ্গীদের খুন খারাবীর নিন্দা করছেন তারা দয়া করে একটি বার তাফসীরগুলো খুলে দেখবেন কি? যেসব খুন খারাবীর কারণে জঙ্গীদের নিন্দা করা হচ্ছে সেটা যদি পাপের কাজ হয়েও থাকে তবু তার চেয়েও বেশি বড় পাপ হলো শিরিক কুফরে লিপ্ত হওয়া বা দেশে ইসলাম বিরোধী আইন কায়েম করা। এই সত্য কথাটি তারা কি একটি বার অনুধাবনের চেষ্টা করবেন? এবং জঙ্গীদের যতটা

নিন্দা করছেন তার চেয়ে একটু বেশি বা সমান পরিমানে সরকারের নিন্দা করে ইনসাফ করার চেষ্টা করবেন?

এবার ফাসাদের বিষয়টা নিয়ে একবার চিন্তা করুন। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। হুজুররা জোর করে এর দায়ভার জঙ্গীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তারা তাগুতী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মানুষ হত্যা করছে। কিন্তু আসলেই কি তাগুতের সাথে যুদ্ধ করা ইসলামে ফাসাদ হিসেবে গণ্য? জিহাদ সম্পর্কে যার সামান্য ধারনা আছে সে জানেন যে এটা ফাসাদ নয়। তাহলে ফাসাদ কি? এ ব্যাপারে আরও একটা আয়াত আমরা উল্লেখ করতে পারি। হুজুররা আয়াতটা জঙ্গীদের ব্যাপারে প্রায়ই পেশ করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

যে কেউ এমন কোনো প্রাণকে হত্যা করে যা অন্য কাউকে হত্যা করেনি বা ফাসাদ সৃষ্টি করেনি তবে সে যেনো সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো। [মায়েদা/৩২]

এই আয়াতটা তেলোয়াত করে হুজুররা প্রায়ই জঙ্গীবাদের নিন্দা করেন। কারণ তারা মানুষ হত্যা করে। সূরা নিসার একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে তার শাস্তি চিরকাল জাহান্নাম। আর তার উপর আল্লাহর গজব ও অভিসাপ এবং তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে কঠিন শাস্তি। [সূরা নিসা/৯৩]

পাঠক একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন এই আয়াতে হত্যা করার অত্যন্ত কঠিন শাস্তির কথা বর্ননা করা হয়েছে। চিরস্থায়ী জাহান্নাম, আল্লাহর গজব, আল্লাহর লা'নত, ভীষণ শাস্তি ইত্যাদি কোনো কিছুই এখানে বলতে বাদ দেওয়া হয়নি। তারপরও এই আয়াতটা হুজুররা খুব বেশি উল্লেখ করেন না। কারণ এখানে মুমিনদের হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। ফলে ওনাদের কাফির ভাইরা এর মধ্যে ঢুকতে পারে না। কিন্তু জঙ্গীরা বেশিরভাগই

কাফিরদের ও নাস্তিক মুরতাদদের হত্যা করে ফলে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এই আয়াতটি উল্লেখ করে খুব একটা লাভ হয় না। একারণে তারা বেশি বেশি সূরা মায়েদার আয়াতটি উল্লেখ করে যেহেতু সেখানে কাফির বা মুমিন ভাগ করা হয়নি। হুজুররা তাই একটু যোগ করে দিয়ে বলেন,

- যে কেউ কোনো মানুষকে হত্যা করে হোক সে মুসলিম অথবা নন মুসলিম।

মজার ব্যাপার হলো, ঐ আয়াতে কিন্তু মানুষের কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে নাফস বা প্রাণ। নাফস বা প্রাণ শব্দটা মানুষ, গরু, পশু-পাখি ইত্যাদি সব কিছুর উপরই প্রযোজ্য হয়। যেমন বলা হয়, কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাওত। অর্থাৎ সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এখন হুজুরদের সূত্র অনুযায়ী যদি মুসলিম কি কাফির এটা উল্লেখ না থাকার কারণে মুসলিম বা কাফিরকে হত্যা করা সমান অপরাধ বলে গণ্য হয় তবে মানুষ কি পশু সেটাও তো এখানে উল্লেখ নেই বরং বলা হয়েছে প্রাণ অতএব মানুষ, গরু, হাঁস মুরগি ইত্যাদি যে কোনো

প্রাণীকে হত্যা করলেই তো সমান পাপ হওয়ার কথা।

কেউ হয়তো বলবে,

- পশু-পাখি যে হত্যা করা যায় তা তো অন্য আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অতএব সেটা এখানে বুঝে নিতে হবে।

আমরা বলব, কাফির, মুশরিক আর নাস্তিক মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করা বা সরাসরি মুসলিম হতে বাধ্য করার নির্দেশ কি অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে নেই? যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায় তাকে হত্যা করার নির্দেশ কি অন্য হাদীসে নেই? সেগুলো ভুলে গিয়ে কেবল একটি আয়াতের উপর নির্ভর করে

- হোক সে মুসলিম বা নন মুসলিম ...

এমন বললে সেটা কি জোচ্চুরী বলে গণ্য হয় না? সেক্ষেত্রে

- হোক সে গরু বা ছাগল ..

এমন বললেই বা দোষ কিসে? এভাবে তালি পট্টি দিয়ে ফকীরের ঝুলার মতো ফতোয়া বানানোটা কি ওলামায়ে কিরামের সাজে?

যাই হোক, এই আয়াতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেনি এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করেনি তাকে হত্যা করা হলে সেটা সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার মতো মহাপাপ। এটা নিঃসন্দেহে সঠিক কথা। কিন্তু আয়াতটার অর্থ সম্পর্কে হুজুররা সামান্য চিন্তা করেছেন কি? আয়াত স্পষ্ট বলছে, যে অন্যকে হত্যা করেনি বা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করেনি তাকে হত্যা করা অন্যায়। অতএব, যে অন্যকে হত্যা করেছে বা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করেছে তাকে হত্যা করা যে মোটেও অন্যায় নয় তা এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন হলো, বিশ্বের কাফির মুশরিক আর তাগুতী শক্তি কি পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করছে না? খুন, ধর্ষণ, হত্যা, গুম এগুলো কি তাগুতের লোকেরা করে না? যদি সেটা করে তবে তাদের সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করাটা কি এই আয়াতের মধ্যে পড়ে?

যদি কেউ বলে,

- অপরাধ যে করে তাকে আঘাত করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কোনো বেসামরিক কাফিরদের হত্যা করতে হবে আমরা এটার সমর্থন করি না।

বেসমারিক কাফিরদের হত্যা করা যায় কি না সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে হুজুরদের আমি দুটি কথা বলতে চাই,

ক) যারা জিহাদ করছে তারা মানুষ, ফেরেস্তা নয়। তাদের কিছু ভুল থাকতে পারে। রসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে বিভিন্ন অভিযানে এধরনের ভুল সংঘটিত হয়েছে। সেসব বিষয়ে আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ঐ সব ভুলের কারণে রসুলুল্লাহ ﷺ সংশ্লিষ্ট সাহাবীকে তিরষ্কার করেছেন তবে তার সকল অবদান অস্বীকার করেন নি। পরবর্তীতে অভিযান পাঠানো বন্ধও করে দেন নি। বরং যতদুর সম্ভব ভুল ত্রুটি সংশোধন করেছেন এবং জিহাদ অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান যুগের জিহাদের অনেক ভুল হতে

পারে সেটা শুধরে দেওয়ার দায়িত্বও আলেমদের আছে। কিন্তু তাই বলে মুজাহিদদের বিপরীতে কাফিরদের সাথে জোট গঠন করে এক তরফা কেবল ভুল ধরে যাওয়া নিঃসন্দেহে সঠিক নয়। বরং যতটুকু ভুল সেটা শুধুরে দেওয়ার পাশাপাশি যেটা নির্ভুল সে কারণে প্রশংসাও করতে হবে। তাগুতের গোলাম ওলামা হজরতরা সেটা করতে পারবেন কি? যদি না পারেন তবে পুরা নিরব থাকাই তাদের জন্য ভাল।

খ) যদি এমন হয় যে বর্তমান যুগে যারা জিহাদ করছে তাদের আপাদমস্তক সবই ভুল তা শুধরানো সম্ভব নয়। তবে ওলামা হজরতরা নিজেরাই একটা সঠিক জিহাদ করে দেখাতে পারেন। তাতে মানুষ ভুল থেকে বেঁচে সঠিকভাবে জুলুমের প্রতিরোধ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু তারা তো তাগুতকে প্রতিরোধ করার কোনো রাস্তা খুলে না দিয়ে কেবলই জঙ্গীবাদের উপর প্রতিশোধমুলক আচরণ করে যাচ্ছেন। অতএব তাদের কথা মুসলিম উম্মাহ আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করলে সেটাই যৌক্তিক হবে।

সুষম সমাধান

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমাদের নিকট এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ওলামায়ে দ্বীন দ্বীনী প্রয়োজনে নয় বরং মালপানি গুছিয়ে নেওয়ার জন্যই তাগুতের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই তারা সবাই একত্রিত হয়ে বৃহত্তর জোট গঠন করেছেন। অতএব, তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক এবং তাদের ফতোয়াবাজীর পরিমাণ যতই তীব্র হোক তাদের হকপন্থী হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। বিপরীতে হকপন্থী মুজাহিদদের সংখ্যা যতই অল্প হোক তাদের হয়তো ছোট দল বলা যায় তবে দলছুট বলা যায় না। ছোট বলে তাদের খাটোও করা যায় না। বরং ইনশাআল্লাহ তারাই হকপন্থী। বস্তুতঃ এক বস্তা তুলা দেখতে যতই বেশি মনে হোক আর তার তুলনায় ছোট একটা লোহার বাটখারা যতই সামান্য মনে হোক সুষ্ঠুভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বস্তাভর্তি তূলার তুলনায় ছোট লোহার বাটখারাও অনেক সময় বেশি ভারি হতে পারে।

যে দায়িত্ব মহান আল্লাহ ﷻ ওলামায়ে কিরামের উপর অর্পণ করেছিলেন তারা তা পালন করেনি। তাই আল্লাহ তাদের বদলে অন্য একদল লোককে বাছাই করেছেন। তিনি বলেন,

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন আর তোমাদের বদলে অন্য একদল লোককে নিয়ে আসবেন। তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [তাওবা/৩৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহ তোমাদের বদলে অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যারা তোমাদের মতো হবে না। [মুহাম্মাদ/৩৮]

লাখ লাখ ওলামা হজরত যে কাজ করলো না বা করতে পারলো না গুটি কয়েক দলছুট যুবক সে কাজ কিভাবে

করতে সক্ষম হলো এই বিতর্কের সুষম সমাধান হলো, প্রথম দলটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন না করার কারণে রাগান্বিত হয়ে মহান রব্বুল আলামীন দ্বিতীয় দলকে বাছাই করেছেন। তিনিই তাদের অন্তরে এই গুরু দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই তারা এটা বহন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম দলটির মতো কাপুরষতা করে পিছিয়ে যায় নি।

إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى (١٣) وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها

তারা ছিল অল্প কয়েকজন যুবক তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর তাদের অন্তরে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম যখন তারা দাঁড়িয়ে বলেছিল, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টাই হলো আমাদের রব তাকে ছাড়া অন্য কোনো ইলাহকে আমরা আহ্বান করি না। [কাহ্‌ফ/১৩,১৪]

সমাপ্ত